কমল চৌধুরী
প্রীতিভাজনেষু

হনিমুন লজ

শ্রুতি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, সোমক ব্যালকনিতে বসে সিগারেট টানছে। শ্রুতি ব্যস্তভাবে বলল, এ কী! তুমি এখনও তৈরি হওনি?

সোমক একটু হাসল। আমি যাচ্ছি না।

যাচ্ছ না মানে? শ্রুতি চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল। হঠাৎ আবার কী হল তোমার?

কিছু না। আসলে ভিড় হইচই ছোটাছুটি আমার ভালো লাগছে না। সোমক মুখটা করুণ করল। ভেবে দেখলাম, যে জন্য এখানে তুমি আর আমি এসেছি, তার সঙ্গে এই প্রোগ্রামটা ঠিক যেন ফিট করছে না।

আশ্চর্য! শ্রুতি জোরে শ্বাস ছাড়ল। কাল রাত্রে প্রোগ্রামটা তুমিই করেছ।

হুঁ! করেছিলাম। কিন্তু—সোমক হঠাৎ থেমে গিয়ে দূরে দৃষ্টিপাত করল।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে?

না না! তেমন কিছু নয়। সোমক হাত বাড়িয়ে শ্রুতির একটা হাত নিল। আস্তে বলল, হনিমুনে এসে ভিড়ে তোমাকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

তার চোখে হাসি ছিল এবং কণ্ঠস্বরে প্রেম। কিন্তু শ্রুতি চটে গেল। কোনও মানে হয়? ওঁরা কী ভাববেন বলো তো? সাড়ে ছটা বেজে গেছে। সবাই নীচে অপেক্ষা করছেন। আর হঠাৎ তুমি বলছ যাবে না।

প্লিজ শ্রুতি! বরং তুমি ওঁদের সঙ্গে যাও। বলো, আমার শরীর একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখানে এসে হিম লাগিয়ে জ্বরমতো হয়েছে।

আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমি বোঝবার চেষ্টা করছ না। কাল রাত্রে ধারিয়া ফল্‌স্‌ দেখতে যাওয়ার কথা যখন তুলি, তখন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা হনিমুনে এসেছি।

সোমক শ্রুতিকে কাছে টেনে আদর করার ভঙ্গি করল। কিন্তু শ্রুতি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, প্রশ্নটা ভদ্রতার। তুমিই প্ল্যান-প্রোগ্রাম করলে। এখন আমরা যদি ওঁদের সঙ্গে না যাই, ব্যাপারটা মোটেও ভালো দেখাবে না। তা ছাড়া ওঁরাও তো হনিমুনে এসেছেন।

সোমক জোরে হাসল। সবাই নয়। কেউ কেউ। যাই হোক, ভদ্রতারক্ষার খাতিরে তুমি ওঁদের সঙ্গ দাও।

শ্রুতি বিরক্ত হল। কী বলছ তুমি !

হঁ্যা। তুমি বরং যাও। আমি এখানে চুপচাপ বসে প্রকৃতি দেখি। জাস্ট্ ভদ্রতার খাতিরে অন্তত ঘণ্টা দু-তিন তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব। তবে প্লিজ, যাবার সময় একটা চুমু-টুমু দিয়ে যাও।

শাট আপ ! চুমু-টুমু অত শস্তা ?

হনিমুনে ওটা খুবই শস্তা—যাকে বলে ড্যাম চিপ।

সোমক উঠে দাঁড়িয়ে শ্রুতিকে টেনে ঘরে ঢোকাল। তারপর যখন সে ওকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে, তখন কেউ দরজায় নক করল। শ্রুতি ছিটকে সরে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজার সামনে কুমকুম দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, পায়েলদি পাঠালেন। সবাই লনে অপেক্ষা করছেন। ওঁর হাজব্যাণ্ড ভদ্রলোক একটা জিপ ম্যানেজ করেছেন।

শ্রুতি আস্তে বলল, এদিকে আমার হাজব্যাণ্ড ভদ্রলোকের হঠাৎ শরীর খারাপ।

কুমকুম সোমকের দিকে তাকিয়ে বলল, জিপে বসে যাবেন। পায়ে হেঁটে তো যেতে হচ্ছে না আর।

সোমক কাঁচুমাচু মুখে বলল, কাল রাত্রে খোলা আকাশের নীচে বসে ছিলাম। অক্টোবরের শেষাশেষি এখানে বড্ড হিম পড়ে যায়। ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বরমতো হয়েছে। সারা শরীরে ব্যথা। তো শ্রুতি আমাকে ফেলে রেখে যেতে চাইছে না। আপনি ওকে টেনে নিয়ে যান বরং।

কুমকুম বলল, ঠিক আছে। শ্রুতিদি আসুন। জাস্ট্ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব আমরা। জানেন শ্রুতিদি ? চমনলালজি বলছিলেন, ধারিয়া ফলসের কাছে নাকি প্রি-হিস্টোরিক এজের কিছু কেভ-পেন্টিং খুঁজে পাওয়া গেছে। একটা ডাইনোসরের ছবি পর্যন্ত ! ভেরি ইণ্টারেস্টিং নয় ?

শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। সোমক হাসল। 'জুরাসিক পার্ক' ফিল্মের প্রভাব ! মার্কিন কালচার ক্রমশ আন্তর্জাতিক মডেল হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিনরাই 'উফো' দেখতে হিড়িক ফেলে দিয়েছিল। এখন উফো-হুজুগ তো ঝিমিয়ে পড়েছে। ডাইনোসর-হুজুগ মাথাচাড়া দিয়েছে। বলে সে শ্রুতির দিকে ঘুরে চোখের ঝিলিক ফেলল।

শ্রুতি হ্যাণ্ডব্যাগটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে ক্ষোভ ছিল।

সোমক দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে পড়ল। সিগারেটটা টানতে গিয়ে দেখল, ফিল্টার টিপে পৌঁছে আগুন নিভে গেছে। সে ওটা নীচে ছুঁড়ে ফেলল। এদিকটাতে খাড়া পাথরের নৈসর্গিক দেওয়াল। তবে দেওয়ালের ফাটলে রঙ্গনা ফুলের মতো অজস্র বুনো লাল ফুলে ঢাকা ঝোপ গজিয়ে আছে। তার নীচে ঢেউখেলানো উপত্যকা। কোথাও ঘন ঘাস ঝোপঝাড় উঁচু-নিচু গাছের জঙ্গল। আবার কোথাও নগ্ন পাথুরে মাটি। কাছে ও দূরে নীল-ধূসর পাহাড় কুয়াশায় কিছুটা অস্পষ্ট।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর সোমক জোরে শ্বাস ফেলল। তার ধারণায় ভুল ছিল না। ফল্‌স্‌ দেখতে শ্রুতি যেতই এবং গেল। অনির্বাণ নামে যে লোকটা পায়েলকে বিয়ে করেছে, শ্রুতি তাকে চেনে। শুধু চেনে না, যেন কোনও সময়ে বেশ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করে সোমক আসলে বুঝতে চেয়েছিল, শ্রুতির প্রতিক্রিয়াটা এখন কেমন—কেন না পায়েল ওই লোকটাকে বিয়ে করেছে।

লোকটার বয়স পায়েলের চেয়ে অন্তত পনের বছর বেশি। সোমকের এটা অনুমান। পায়েল পঁচিশ বছরের যুবতী। তা হলে অনির্বাণ রুদ্র চল্লিশ। বলিষ্ঠ আঁটোসাঁটো গড়ন। সে নাকি কলকাতার কোনও বড় কোম্পানির চিফ একজি-কিউটিভ। তবে সে খুব আলাপী আর হাসিখুশি প্রকৃতির লোক। সবতাতেই উৎসাহী আর নাকগলানো। সব সময় বকবক করে।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে, পায়েল ব্যানার্জির মতো মেয়ে ওকে বিয়ে করে বসল কেন? আরও একটা আশ্চর্য, সোমক ও শ্রুতি বিয়ের পর যেখানে হনিমুনে এসেছে, ওরাও সেখানে হনিমুনে চলে এসেছে। কাকতালীয় যোগাযোগ? শ্রুতি রাত্রে বলছিল, সে জানত না পায়েল বিয়ে করেছে এবং সে নাকি অবাক হয়েছে ওকে এখানে দেখে। অনির্বাণ সম্পর্কে শ্রুতির ব্যাখ্যা হল, ও তার দাদা ধৃতিমানের বন্ধু।

কে জানে কী ব্যাপার! শুধু এটাই স্পষ্ট যে, শ্রুতি ও অনির্বাণ রুদ্রের মধ্যে ভালোরকমের জানাশোনা আছে। পায়েলের সঙ্গে কথাবার্তায় শ্রুতির যেন কিছু ঈর্ষার আভাস লক্ষ্য করেছে সোমক।

আবার এও ঠিক, পায়েলকে এখানে তার স্বামীর সঙ্গে হনিমুনে আসতে

দেখে সোমকও মনে মনে রুষ্ট আর ঈর্ষান্বিত। পায়েল সোমককে ল্যাং মেরেছিল। টানা তিন বছর চুটিয়ে প্রেম করাটা যে পায়েলের নিছক খেলা, তা বুঝতে পারেনি সোমক। প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা খুব তীব্র। গভীরে একটা ক্ষত থেকে যায়।

সোমক আবার একটা সিগারেট ধরাল।

ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত ও ছোট শিল্পকেন্দ্র ধারানগর। সেখান থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে এবং ধারিয়া নদীর তীরে একটা টিলার মাথায় এই 'হনিমুন লজ'। কাছাকাছি কোনও বসতি নেই। বছর দুই আগে এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী এই দোতলা লজটি তৈরি করেছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক চমনলালের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ হয়েছে সোমকের তিনি বলছিলেন, তাঁর যৌবনে এখানে একটা পাথরের পুরনো বাংলো ছিল। বাংলোর মালিক ছিলেন ফাদার পিয়ার্সন। তখন সেই পাদ্রি ভদ্রলোক অথর্ব বৃদ্ধ। কেউ এসে থাকতে চাইলে ঘর ভাড়া দিতেন। এখনকার মতো বিদ্যুৎ ছিল না। টেলিফোন থাকার কথা তো ভাবাই যায় না। চমনলালজি বিয়ের পর সেই বাংলোতে হনিমুনে এসেছিলেন। তো এতকাল পরে রাজেন্দ্র অগ্রবাল বাংলোর ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দোতলা বাড়ি তৈরি করেছেন। বিদ্যুৎ আর টেলিফোনের ব্যবস্থাও হয়েছে। সে-খবর পেয়ে চমনলাল সস্ত্রীক এসে পড়েছেন স্মৃতির টানে।

একসময় চারদিকে ঘন জঙ্গল ছিল। বুনো জন্তু-জানোয়ারও ছিল প্রচুর। হনিমুনে এসে রীতিমতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল চমনলালজির। এখন এখানে প্রকৃতির সেইসব চমকপ্রদ সৌন্দর্য আর বিভীষিকা নেই। তবু স্থানটির আকর্ষণ আছে। বিশেষ করে এই শেষ শরতে আবহাওয়া যেমন মনোরম, ধারিয়া নদী আর ছোট ছোট উপত্যকার সৌন্দর্যও চোখ-জুড়োনো। নব বিবাহিত যুবক-যুবতীদের হনিমুনের জন্য যে নির্জনতা আর স্বাধীনতা দরকার, তা এখানে অপরিমিত।

ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর বছর। তাঁর স্ত্রী রজনীদেবীর বয়সও ষাটের ওধারে। কিন্তু দুজনেই শক্তসমর্থ। যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পটু।

হনিমুন লজের একতলায় দুটো এবং দোতলায় পাঁচটা স্যুইট। এ ছাড়া আধুনিক কেতায় নীচে ডাইনিং, লাউঞ্জ এসবও আছে। রিসেপশন কাউন্টার আছে। ম্যানেজার রঘুবীর রায় অতিশয় সজ্জন মানুষ। তিনি হাসতে হাসতে বলছিলেন, এখানে হনিমুনের জন্যই সবাই আসে। তবে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি

কোনও নিয়ম নেই। একা কেউ এসে থাকতেও পারেন। স্যুইট খালি থাকলে তো তাঁকে না বলা যায় না। আগামী এক সপ্তাহ ধরে কোন স্যুইট খালি থাকছে না। এখন কোনও দম্পতি হনিমুনে এলে দুঃখের সঙ্গে তাঁকে না বলতেই হবে। অবশ্য ধারানগরের কাছাকাছি অনেক হোটেল আছে।

সিগারেট শেষ করে সোমক উঠল। প্রায় পৌনে সাতটা বাজে। আবহাওয়ায় শীতের আমেজ আছে। রাত-পোশাক ছেড়ে সে প্যান্ট-শার্ট পরে নীচে গেল। ম্যানেজার রঘুবীর লাউঞ্জের সামনে বড় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'মর্নিং স্যার' বলে সম্ভাষণ করলেন। আপনি ফল্‌স্‌ দেখতে গেলেন না ?

সোমক বলল, না। শরীর ভালো নেই।

ডাক্তারের দরকার হলে বলবেন স্যার।

বলব।

সোমক লনে নেমে ডানদিক ঘুরে বাগানে গেল। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটি। এখানে-ওখানে পাথরের মসৃণ বেদি আর কাঠের বেঞ্চ। চৌকো বা গোল রঙিন মরশুমি ফুলের কয়েকটা বাগিচা এবং কোথাও কোথাও ঘন পাতায় ভরা বেঁটে দেশি-বিদেশি গাছ। এটা লজের দক্ষিণ দিক। কোণে একটা গাছের তলায় বেঞ্চে এক যুবতীকে দেখে সোমক থমকে দাঁড়াল।

গতরাত্রে লাউঞ্জে সোমক ওকে এক যুবকের সঙ্গে দেখেছিল। ডিনারের আগে অনির্বাণ রুদ্র সাইট-সিইং প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনার সময় ছোটখাটো ককটেল পার্টি মতো দিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে যা হয়। কড়া ও মিঠা পানীয়ের গ্রাস হাতে যথেচ্ছ হইহল্লা, অতিউৎসাহীদের একটু নাচানাচি, ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিক। চমনলালজির মতো মানুষও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নাচতে চাইছিলেন। কিন্তু রজনী-দেবীর অনিচ্ছা। অগত্যা পায়েল বৃদ্ধের সঙ্গে নাচল। অনির্বাণ শ্রুতির সঙ্গে নাচতে চাইছিল। কিন্তু সোমক শ্রুতিকে ছাড়েনি। কুমকুম তার স্বামী দীপকের নাচের জুড়ি। শেষের দিকে দীপক ধপাস করে কুশনে বসে পড়লে অনির্বাণ কুমকুমকে পেয়ে যায়। দীপকের একটু নেশা হয়েছিল।

আর হ্যাঁ—সেই সময় এই যুবতী তার সঙ্গীকে নিয়ে একটু তফাতে বসে ছিল। অনির্বাণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ওদের লক্ষ্য করেনি। সোমকের মনে হয়েছিল, যারা দলে মিশতে চায় না, তাদের টানাটানির অর্থ হয় না, তা ছাড়া ভুল করে অপমানজনক কথা বলে বসতেই পারে।

কাল রাতের পুরো ছবিটি মনে ভেসে এসেছিল সোমকের। এখন সকালে

যুবতীটি এখানে একা চুপচাপ বসে আছে এবং ওর সঙ্গীটি নেই। দাম্পত্যকলহ নাকি?

অবশ্য যারা এই লজে আসে, তারা সবাই দম্পতি কি না বলা কঠিন। প্রেমিক প্রেমিকা স্বামী-স্ত্রী সেজেও আসতে পারে। রঘুবীর বলছিলেন এসব কথা। বলছিলেন, তেমন কোন জুটি এলেও তাঁর কী করার আছে?

এই বাগানে সোমক নির্জনতা চেয়েছিল। সে একটু বিরক্ত হয়ে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই যুবতী অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ইংরেজিতে বলল, আপনি ইচ্ছে করলে এখানে বসতে পারেন।

সোমক বলল, নাহ্। আপনাকে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না।

কেন একথা বলছেন?

আপনি সম্ভবত আপনার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। সোমক একটু হাসল। হনিমুন লজের নাকি একটা রোমান্টিক ট্রাডিশন ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে।

আমি কারও জন্য এখানে অপেক্ষা করছি না। কাজেই এক্ষেত্রে কোনও রোমান্টিসিজ্ম্ নেই।

আপনার স্বামী কি কোথাও বেরিয়েছেন? বলেই সোমক মুখটা একটু কাঁচুমাচু করল। সরি! আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না।

নাক গলানো কেন হবে? প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক। ভোরে শোভন কোথায় বেরিয়েছে। আমাকে বলে যায়নি!

সোমক তাকাল। একটু পরে আস্তে বলল, তাই বুঝি? তাহলে তো এটা উদ্বেগের বিষয়।

যুবতী ঠোঁটের কোণায় হাসল। নাহ্। ওর জন্য আমার কোনও উদ্বেগ নেই। আপনারা অনেকেই কলকাতা থেকে এসেছেন!

হ্যাঁ। আপনারা?

বার্নপুর থেকে। আমার নাম ঋতুপর্ণা রায়। পর্ণা নামে সবাই ডাকে। আমার বাবার বাড়ি কলকাতায় ছিল। বাড়িটা আর নেই। তাই কলকাতা যাওয়া হয় না আগের মতো।

সোমক এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চে বসল। আমি সোমক চ্যাটার্জি। আমার স্ত্রী শ্রুতি একটু আগে দল বেঁধে জলপ্রপাত দেখতে গেল। আমি যাইনি। আসলে ভিড় হইহল্লা আমার পছন্দ নয়।

কাল রাতে লাউঞ্জে ককটেল পার্টিতে আপনি নাচছিলেন।

সোমক শুকনো হাসি হাসল। ওটা নিছক ভান বলতে পারেন। একালীন সংস্কৃতির পাল্লায় পড়েছিলাম। তো আমরা বাংলায় কথা বলছি না কেন? আমরা দুজনেই বাঙালি!

ঋতুপর্ণা হাসল না। এবার বাংলায় বলল, একালীন সংস্কৃতির পাল্লায় আমাকে সব সময় পড়তে হয়। তাছাড়া আমার স্বামী শোভন রায় অ্যামেরিকায় পড়াশুনো করে এসেছে। মার্কিন ইংলিশ বলে। কদাচিৎ বাংলা।

কিন্তু উনি কাল রাতে আমাদের পার্টিটা এড়িয়ে থাকলেন। আমরা যা করছিলাম, তা মার্কিন কালচার।

ঋতুপর্ণা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, কাল ওর মন ভালো ছিল না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। কতকটা আপনার মতো।

কেন?

একটু আগে বললেন না?

কী বললাম বলুন তো?

ভিড় হইহল্লা আপনার পছন্দ নয়। তাই স্ত্রীর সঙ্গে ফল্‌স্ দেখতে গেলেন না। তার মানে, আপনার মন আজ ভালো নেই।

সোমক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে চপ্পলের তলায় নেভাল। তারপর আস্তে শ্বাস ছেড়ে বলল, আসলে আমরা হনিমুনে এসেছি। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

ঠিক। দুজন বাদে আমরা সবাই হনিমুনে এসেছি।

দুজন বাদে? আপনি লক্ষ্য করেছেন দেখছি!

আপনি করেননি?

হুঁ। করেছি। দোতলায় আমার পাশের স্যুইটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আছেন। পাদ্রিদের মতো চেহারা। ম্যানেজার বলছিলেন, রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার। সাম কর্নেল—কী যেন নামটা! দেখলে বিদেশি মনে হয়।

নীচের স্যুইটে এক অবাঙালী মহিলা একা আছেন।

হ্যাঁ। সুভদ্রা ঠাকুর। আলাপ তাঁর সঙ্গেও হয়নি। ম্যানেজার বলছিলেন, উনিও নাকি চমনলালজির মতো স্মৃতির টানে এখানে এসেছেন। ওঁর স্বামী—ওঃ! সে একটা সাংঘাতিক গল্প মনে হয়।

বলুন না শুনি!

সোমক একটু চুপ করে থাকার পর বলল, প্রায় পঁচিশ বছর আগে এখানে ছিল ফাদার পিয়ার্সনের বাংলো। সুভদ্রা দেবী স্বামীর সঙ্গে হনিমুনে এসেছিলেন। ধারিয়া ফল্‌সে বেড়াতে গিয়ে কী ভাবে মিঃ ঠাকুর নাকি পা হড়কে প্রপাতের জলে পড়ে যান। আশ্চর্য ব্যাপার হল, তাঁর ডেডবডি পাওয়া যায়নি।

ঋতুপর্ণা চমকে উঠল। সে কী!

প্রপাতের নীচে একটা লেক মতো আছে। সেখানে নাকি প্রচুর কুমির থাকত। পুলিসের মতে, ডেডবডি কুমিরে খেয়ে ফেলেছে।

তাই ভদ্রমহিলাকে ছিটগ্রস্ত মনে হচ্ছিল।

সোমক সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

তেমন কিছু না। ওই গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। চোখে চোখ পড়লে বললেন, জলপ্রপাতের ভূত দেখতে যাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারি। পায়েচলা রাস্তায় ধারিয়া ফল্‌স্ এখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার।

কখন গেলেন উনি?

আধঘণ্টা আগে।

সোমক একটু হাসল। আপনি ওঁর সঙ্গে গেলে পারতেন!

কেন?

আপনার স্বামী ফিরে এসে আপনাকে খুঁজে পেতেন না। বেশ একটা শোধ নেওয়া হত।

ঋতুপর্ণা কথাটা কানে নিল না। সে সোমকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল, আপনাকে আমি দেখেছি। ভীষণ চেনা মনে হচ্ছে। ঠিক মনে করতে পারছি না।

বার্নপুরে আমি কখনও যাইনি।

ঋতুপর্ণা চঞ্চল হয়ে উঠল। না না! আপনাকে দেখেছি। আচ্ছা, আপনি কি বিজ্ঞাপনে মডেলিং করেন?

সোমক আস্তে বলল, ঠিক ধরেছেন। কয়েকটা টি-ভি ফিল্মেও হিরোর রোল করেছি।

তাই বলুন! কাল রাতের পার্টিতে আপনাকে দেখে আপনার ভয়েস শুনে একবার মনে হয়েছিল—

ও কথা থাক। আপনার স্বামী শোভনবাবু সম্পর্কে আমার কেন যেন উদ্বেগ হচ্ছে। উনি কী করেন?

ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ওর জন্য আপনার উদ্বেগের কারণ নেই। ও একটু খেয়ালি। ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়াল। বরং চলুন না আমরা নদীর ধারে গিয়ে বসি। কী? আপত্তি আছে?

সোমক একটু ইতস্তত করার পর উঠে দাঁড়াল। বেশ তো! চলুন।

॥ দুই ॥

সওয়া আটটা নাগাদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার হনিমুন লজে ফিরলেন। রিসেপশন কাউন্টার থেকে ম্যানেজার রঘুবীর রায় সম্ভাষণ করলেন, মর্নিং কর্নেল সাব!

মর্নিং রঘুবীর!

কতদূর ঘুরলেন আজ?

ধারিয়া ফল্‌স্‌ অব্দি।

কতগুলো প্রজাপতি ধরলেন?

একটাও না। এমন কি দুষ্টু প্রজাপতিগুলো ছবি তোলারও সুযোগ দেয়নি। তবে একটা সুন্দর অর্কিডের চারা পেয়েছি। আর বাইনোকুলারে ধারা লেকের ধারে দুটো নীল সারস দেখেছি। গত বছর তুমি নীল সারসের কথা বলেছিলে। তখন ভেবেছিলাম জোক!

আমি সব সময় সত্যি কথা বলি কর্নেলসাব।

ধন্যবাদ। নীল সারস দম্পতিও সম্ভবত এ সময় হনিমুনে আসে। কারণ বাইনোকুলার দিয়ে সারা এলাকার গাছপালা তন্নতন্ন করে খুঁজে ওদের বাসা দেখতে পাইনি।

আমার হনিমুনারদের দেখেছেন!

দেখেছি। তবে আলাপ করতে যাইনি। নববিবাহিত দম্পতিদের এ সময় এড়িয়ে থাকাই ভালো। কর্নেল লাউঞ্জে ক্লান্তভাবে বসলেন। রঘুবীর! এখানেই এক পেয়ালা কফি খেয়ে স্যুইটে যাব।

ম্যানেজার তখনই কিচেনে খবর পাঠিয়ে কাছে এলেন। আস্তে এবং মুচকি হেসে বললেন, গতবছরের মতো এবারও না হনিমুনাররা বউ বদল করে ফেলে!

কর্নেল একটু হাসলেন। আমি ওদের লক্ষ্য করিনি। তুমি তেমন কিছু দেখেছ নাকি?

চ্যাটার্জিসাব ফল্‌স্‌ দেখতে যাননি। ওঁর বউ গেছেন। এদিকে রায়সাব একটু আগে ধারানগর থেকে টেলিফোনে তাঁর বউকে ডেকে দিতে বললেন। রঘুবীর শব্দ করে হাসলেন। বলছিলাম আমি সব সময় সত্যি কথা বলি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আমাকে কোনও কোনও সময় মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। অকারণ দাম্পত্যকলহে ইন্ধন যোগানো কি উচিত? বলুন কর্নেলসাব!

ঠিক। তো রায়সায়েবের স্ত্রীকে তুমি খুঁজে পাওনি?

চ্যাটার্জিসাবের সঙ্গে রায়সাবের বউকে বাগানে কথা বলতে দেখেছিলাম। তারপর ওঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

তা হলে ধারিয়া নদীর ধারে দুজনকে দেখে এলাম। কিন্তু তুমি রায়সায়েবকে কী বললে?

বললাম আপনার স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। ব্যস! আর কিছু বলিনি।

কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এবারও কি বউবদলের সম্ভাবনা লক্ষ্য করছ রঘুবীর?

রঘুবীর মুখোমুখি বসে মিটিমিটি হেসে বললেন, চ্যাটার্জিসাব শরীর খারাপ বলছিলেন। কিন্তু উনি দিব্যি সুস্থ। তারপর দেখুন, মিসেসকে ফলস দেখতে পাঠিয়ে বাগানে গেলেন। তখন সেখানে মিসেস রায় একা বসে ছিলেন। আপনি মিসেস চ্যাটার্জিকে যদি ফল্‌সের ওখানে না দেখে থাকেন—

লক্ষ করিনি। আমি নীল সারসদম্পতিকে দেখছিলাম। দুর্লভ প্রজাতির সারস।

কফি এল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে একটা পোকা ঝেড়ে ফেললেন। রঘুবীর বললেন, কাল রাতে ডিনারের পর মিসেস রুদ্রকে লনে একা বসে থাকতে দেখেছি। মিঃ রুদ্রের নেশা হয়েছিল। সম্ভবত কিছু টের পাননি। মিসেস রুদ্র কারও জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন।

কর্নেল হাসলেন। রঘুবীর! তুমি গোয়েন্দাগিরি করো দেখছি!

স্যার! অগ্রবালজির হুকুম আছে, যেন হনিমুন লজের সুনাম হানি না হয়। নববিবাহিত দম্পতিরা স্বভাবত ঈর্ষাকাতর হয়ে থাকে। দৈবাৎ সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলেই আমার চাকরি যাবে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন। সাংঘাতিক কিছু ঘটবে বলে কি আঁচ করছ রঘুবীর?

রঘুবীর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনাকে মিসেস ঠাকুরের কথা বলেছি। ওঁর হাবভাব দেখলে কেমন গা ছমছম করে। হনিমুনারদের দিকে এমন চোখে তাকিয়ে থাকেন, যেন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ওঁর চোখের চাউনি লক্ষ্য করেছেন? অগ্রবালজির চিঠি না আনলে ওঁকে এবার স্যুইট দিতাম না। গত মরশুমে এসে রাত দুপুরে মালীর ঘর থেকে একটা খন্তা চুরি করেছিলেন। সে এক অদ্ভুত উপদ্রব!

কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরালেন। ধোঁয়ার ভেতর বললেন, হ্যাঁ। মানসিক রোগীরা অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে। যাই হোক অর্কিডের চারাটা বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি উঠি রঘুবীর! আমি নটায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার বেরুব।

ঠিক আছে স্যার!

কর্নেল দোতলায় তাঁর স্যুইটে ফিরলেন। অর্কিডের চারাটা দক্ষিণের জানালার গোবরাটে রেখে বাথরুমে গেলেন। তারপর পোশাক বদলে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলেন।

প্রতিটি স্যুইটের ব্যালকনি আছে। কিন্তু এক ব্যালকনি থেকে অন্য ব্যালকনি দেখা যায় না। ডানদিকে একটা করে দেওয়াল তোলা আছে। বাড়িটির পশ্চিমে ব্যালকনিগুলো থাকার একটা সুবিধে, বহুদূর অব্দি প্রসারিত নিসর্গদৃশ্য চোখে পড়ে। পূর্বদিকে সারিবদ্ধ গাছের ভেতর দিয়ে উৎরাই রাস্তাটি একটা হাইওয়েতে মিশেছে। সেখানে যানবাহনের উপদ্রব। কর্নেলের স্যুইট থেকে দক্ষিণে ধারিয়া নদী চোখে পড়ে। নীচের সুদৃশ্য বাগানটিও দেখা যায়।

বাইনোকুলার তুলে নদীর ধারে সোমক চ্যাটার্জি আর ঋতুপর্ণা রায়কে একবার দেখে নিলেন কর্নেল। ওরা একটা গাছের তলায় পাথরের ওপর বসে কথা বলছে। একটু পরেই কর্নেলের মনে হল, তিনি যা করছেন, তা অশালীন। রঘুবীর রায় হনিমুনারের ব্যাপারে নাক গলাতেই পারেন। কর্নেল কেন নাক গলাবেন?

বরং নিসর্গের অবাধ স্বাধীনতায় যুবক-যুবতীদের দেখতে তাঁর ভালো লাগে। কেন না তাঁর ধারণা, প্রেমিক-প্রেমিকারাই প্রকৃতিকে অর্থপূর্ণ করে! অবশ্য রঘুবীর বউ বদলের কথা বলছিলেন। হনিমুনে এসে নাকি একজনের বউ অন্যজন ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বোঝা যায়, বিয়ে-করা বউ নয়, প্রেমিক-প্রেমিকা। তবে ব্যাপারটা রঘুবীরের দৃষ্টিতে যত আপত্তিকর হোক, এমন কিছু তো স্বাভাবিক

ঘটনাই। শুধু কোনও 'সাংঘাতিক ঘটনা'—

সাংঘাতিক ঘটনা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন রঘুবীর? ঈর্ষা থেকে হিংসা এবং হিংসা থেকে খুনোখুনি?

নড়ে বসলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। না না! তেমন কিছু না ঘটাই উচিত। বহু বছর ধরে খুনোখুনির ব্যাপারে নাক গলিয়েছেন। আর নাক গলাতে ইচ্ছে করে না। প্রকৃতি আর প্রেমের মধ্যে রক্ত জিনিসটা বড় কদর্য। অথচ তাঁর এই যেন নিয়তি, যেখানেই যান সেখানেই এক চিরন্তন ঘাতক তাঁর সামনে লাশ ছুঁড়ে ফেলে চ্যালেঞ্জ করে!

নিভে যাওয়া চুরুটটা জেলে কর্নেল নীল সারসদম্পতির কথা ভাবতে থাকলেন। ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে কীভাবে ওদের ছবি তোলা যায়, সেজন্য একটু কলা-কৌশল দরকার। কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক হাতে বাইনোকুলার তুলে চোখে রেখে কর্নেল পশ্চিমের অসমতল উপত্যকা দেখতে লাগলেন।

সহসা চোখে পড়ল পশ্চিমে ধারিয়া নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বেরিয়ে এল। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটারের বেশি লোকটার পেছন দিক দেখা যাচ্ছিল। পরনে প্যান্টশার্ট মাথায় টুপি। সে একটু পরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হল। ওদিকেই ধারিয়া জলপ্রপাত।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও আর তাকে দেখা গেল না। কে সে? ওখানে সে কী করছিল?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে নিজের প্রতি বিরক্ত হলেন। সম্ভবত ম্যানেজার রঘুবীর নানাধরনের গল্প বলে। তাঁকেও নিজের মতো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত করে ফেলেছেন!

নটা বাজলে কর্নেল নীচের ডাইনিং হলে ঢুকলেন। ডাইনিং হল এখন ফাঁকা। রঘুবীরকে দেখা যাচ্ছিল না। কিচেনবয় জগদীশ ব্রেকফাস্ট আনল। তাকে ম্যানেজার সায়েবের কথা জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। সে আস্তে বলল, ম্যানেজারসাব একটু আগে মোটরবাইকে চড়ে বেরিয়ে গেছেন।

কর্নেল ব্রেকফাস্ট করতে করতে দেখলেন, সুভদ্রা ঠাকুর লাউঞ্জে ঢুকে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। পাগলাটে চাউনি। দরজা দিয়ে কর্নেলকে দেখার পর প্রৌঢ়া মহিলা ডাইনিং হলে ঢুকলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, কাল থেকে দেখছি আপনি আমাকে ফলো করে বেড়াচ্ছেন। আপনার উদ্দেশ্য কী? কে আপনি?

কর্ণেল হাসলেন। মর্নিং মিসেস ঠাকুর!

সুভদ্রা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে কাছে এলেন। আমাকে এভাবে ভোলাতে পারবেন না! আমি জানতে চাই কে আপনি?

আপনাকে ফলো করে বেড়াচ্ছি, এ ধারণা আপনার মাথায় কেন এল বলুন তো?

সুভদ্রা মুখোমুখি বসে বিকৃত মুখে বললেন, আপনার ওই বাইনোকুলার! আমি ওটাকে ভীষণ ঘৃণা করি। আপনি জানেন না, আমার চোখ দুটো ওটার মতো শক্তিশালী। অনেক দূরের জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। যখনই যেখানে গিয়ে যেদিকে তাকাচ্ছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমাকে আলবাত্ ফলো করে বেড়াচ্ছেন। কাজেই এর একটা ফয়সালা হওয়া উচিত। কে আপনি?

কর্ণেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে দিলেন।

সুভদ্রা কার্ডটা খুঁটিয়ে পড়ে দেখার পর বললেন, আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এবং বাঙালি! আপনি নেচারিস্ট্! আমার স্বামী জিতেন্দ্রও প্রকৃতিপ্রেমিক ছিল। বাইনোকুলার তারও ছিল। কিন্তু সে ওটা দিয়ে আপনার মতো কারও গতিবিধির ওপর নজর রাখত না।

আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম!

কারও-কারও বিকৃত রুচি থাকে। সুভদ্রার মুখে-চোখে পাগলাটে হাসি ফুটে উঠল। তারা আড়াল থেকে যুবক-যুবতীদের আচরণ উপভোগ করে। আমি দেখেছি! কিন্তু আমাকে দেখার কী আছে? আমার বয়স প্রায় বাহান্ন বছর। অনেক আগেই অকালবার্ধক্য আমাকে গ্রাস করেছে!

কিচেনবয় জগদীশ এসে সেলাম ঠুকে বললে, ব্রেকফাস্ট ম্যাডাম?

হ্যাঁ। নিয়ে এস। এই কর্নেল ভদ্রলোকের সঙ্গে ফয়সালা করব এবং খাব।

সুভদ্রা নিষ্পলক চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিটা অস্বস্তিকর। কর্ণেল দ্রুত ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, রঘুবীরের কাছে শুনলাম আপনি প্রতি বছর এখানে স্মৃতির টানে চলে আসেন।

আসি। পঁচিশ বছর ধরে আসছি! রাজেন্দ্র এই লজ যখন তৈরি করেনি এবং ফাদার পিয়ার্সনের বাংলো হানাবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, তখনও এসেছি। একা! চিন্তা করুন!

আপনার সাহস আর শারীরিক সামর্থ্য দেখে অবাক হয়েছি।

আপনাকে অবাক করার মতো আরও অনেক কিছু আমার আছে কর্নেল সরকার!

যেমন?

আমি গুপ্তবিদ্যা জানি। উইচক্র্যাফ্‌ট্‌। এবং তার সাহায্যে আমার স্বামীর আত্মাকে ডেকে আনতে পারি। লোকে বলে ভূত। আমার সঙ্গে কেউ একা ধারিয়া ফল্‌সে গেলে জিতেন্দ্রর আত্মাকে দেখাতে পারি। কিন্তু কেউ সাহস করে যেতে চায় না।

জগদীশ ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। কর্নেল লক্ষ্য করলেন: ভদ্রমহিলা নিরামিষাশী। দুধে কর্নফ্লেক ফেলে চামচে মাখাতে মাখাতে খুব আস্তে বললেন, জিতেন্দ্রর আত্মা আমাকে বলেছে কে তাকে ধাক্কা মেরে প্রপাতে ফেলে দিয়েছিল। আমি আসলে তাকে খুঁজতেই এখানে আসি। কাকেও বলবেন না, আমি তার দেখা পেয়ে গেছি।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, রঘুবীর বলছিল আপনার স্বামীর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—পুলিস ভালো করে খোঁজেনি। সুভদ্রা ফের ফিসফিস করে বললেন, হত্যাকারী লাশটা কোথায় পুঁতেছিল জিতেন্দ্র আমাকে বলেছে।

কোথায়?

বলব না।

বললে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি!

ভুলে যাবেন না আমি ডাকিনীবিদ্যা জানি। কারও সাহায্যের দরকার আমার হবে না।

আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে দেখতে পেয়েছেন বললেন!

হ্যাঁ। পেয়েছি। তাকে এমন শাস্তি দেব—সুভদ্রা অদ্ভুত শব্দে হেসে উঠলেন।

সর্বনাশ। আপনি তাকে মেরে ফেলবেন নাকি? মিসেস ঠাকুর! তা হলে কিন্তু আপনি খুনের দায়ে পড়বেন।

সুভদ্রা ভেজিটেব্‌ল্‌ স্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়ে বললেন, তাকে ঠিক এইভাবে কামড়ে খাব।

কর্নেল ওঁর কথাবার্তা উপভোগ করছিলেন। ভদ্রমহিলা সত্যিই মানসিক

রোগী। একটু পরে কর্নেল বললেন, গত অক্টোবরে এসে আপনি নাকি মালীর ঘর থেকে একটা খন্তা নিয়েছিলেন? তা কি আপনার স্বামীর লাশ উদ্ধারের জন্য?

চুপ! মুখ ফসকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আর একটা কথা নয়। সুভদ্রা চোখ কটমট করে ফের বললেন, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার কেটে পড়ুন। আমার খাওয়ার দিকেও আপনি নজর রেখেছেন, সে কি বুঝতে পারছি না?

কর্নেল হাসি চেপে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। নীল সারস-দম্পতিকে যদি কোনও কৌশলে ক্যামেরাবন্দি করা যায়!

নিচু কম্পাউণ্ড ওয়ালের বাইরে গিয়ে কর্নেল ডানদিকে ঘুরলেন। ওদিকে একটু-খানি হেঁটে গেলে পূর্বগামিনী ধারা নদী। ঢালু অসমতল মাটির ওপর নানা গড়নের পাথর, ঝোপঝাড় আর গাছপালা চমৎকার ল্যাডস্কেপ হয়ে আছে। নদীর কাছাকাছি পৌঁছে সেই গাছটার দিকে তাকালেন কর্নেল। সোমক চ্যাটার্জি ও ঋতুপর্ণা রায়কে দেখতে পেলেন না। বাইনোকুলারে ওদের খুঁজতে থাকলেন। একটু পরে দেখলেন, কিছুটা দূরে বাঁদিকে হনিমুন লজের রাস্তা ধরে সোমক চ্যাটার্জি একা হেঁটে চলেছে। রাস্তার দুধারে ঘন শ্রেণীবদ্ধ গাছ। তাই তাকে তত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

ঋতুপর্ণা পরস্ত্রী। কাজেই সে সম্ভবত অন্য পথে গাছপালা বা পাথরের আড়াল দিয়ে একটা লজে ফিরে যাচ্ছে।

নেহাত খেয়ালবশে কর্নেল দুর্লভ প্রজাতির কোনও পাখির মতো বাইনো-কুলারে তাকে খুঁজতে থাকলেন। এখান থেকে হনিমুন লজের সদর গেট সোজাসুজি একটু উঁচুতে চোখে পড়ে। কারণ বাড়িটা একটা টিলার মাথায়। কিছুক্ষণ পরে সোমক চ্যাটার্জি গেটে ঢুকে গেল। কিন্তু ঋতুপর্ণা কোথায়?

আরও কিছু সময় কেটে গেল। তারপর কর্নেল নদীর ধারে সেই গাছটার দিকে নেমে গেলেন। যে পাথরে ওরা দুজনে বসে ছিল, সেখানে ফিরে দাঁড়ালেন। অমনি চমকে উঠলেন। পাথরের ওপর একটুখানি লালরঙ ছিটকে পড়েছে। রক্ত?

।। তিন ।।

ধারিয়া জলপ্রপাতের একধারে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের তলায় হনিমুনাররা

ব্রেকফাস্ট করছিল। অনির্বাণ রুদ্রের আয়োজন ছিল তাক লাগানো। স্যাণ্ডউইচ, সেদ্ধ ডিম, কলা আর আপেল। আসার পথে শালপাতার ছাউনি দেওয়া এক আদিবাসীর দোকানে প্রচুর তেলেভাজা কেনা হয়েছিল। এখানে পৌঁছেই সেগুলো সাবাড় হয়েছে। বেলা নটায় এখন ব্রেকফাস্ট। দুটো বড় ফ্লাস্কভর্তি চা পেপার-কাপে বিলি করছিল পায়েল। ততক্ষণে প্রপাত দেখতে আসা আরও মানুষের ভিড় বেড়েছে। কয়েকটি পিকনিকপার্টিও এসে গেছে। টেপরেকর্ডার বাজাচ্ছিল তারা। তবে প্রপাতের প্রচণ্ড গর্জনে সব শব্দই চাপা পড়ছিল।

শ্রুতির হাবভাবে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিল পায়েল। সে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। পায়েল তাকে চা দিতে গিয়ে চোখে হেসে বলল, ফিরে গিয়ে সোমককে একটু ধাঁতানি দেব। তুমি জানো ও আমাকে ভয় পায়।

শ্রুতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু হাসল। কে কাকে ভয় পায় বলা কঠিন পায়েল। আমার ধারণা, তুমিই ওকে ভয় পাও।

কেন ভয় পাব শুনি ?

তুমি গিয়ে ইনসিস্ট্ করলে ও নিশ্চয় আসত !

পায়েল চোখেমুখে কপট রোষের ভঙ্গি করল। বয়ে গেছে আমার ! তোমার বর।

সত্যি কথাটা বলব পায়েল ?

স্বচ্ছন্দে।

এখানে এসে সোমককে দেখে তুমি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে ! মডেলিংয়ে তোমার জুটি ছিল ও।

সোমককে দেখে আমি নার্ভাস হব কোন্ দুঃখে ? হাসালে শ্রুতি ! বরং তুমিই আমার বরকে দেখে—পায়েল চোখ নাচিয়ে সকৌতুকে চাপা স্বরে ফের বলল, শ্রুতি ! লেটস্ হ্যাভ এ ফান। অনির্বাণের সঙ্গে একটু প্রেম-প্রেম খেলো না দেখি !

দেখ পায়েল, সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত।

ও মা ! তুমি যে রেগে গেলে মনে হচ্ছে !

শ্রুতি হেসে বলল। নাহ্ ! রাগিনি। বরং তোমার বরকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলে কুমকুমকে অ্যাপ্রোচ করতে পারো। কাল রাতে কুমকুম তোমার বরের সঙ্গে নাচছিল।

নাহ্। কুমকুম বোকাসোকা মেয়ে। তা ছাড়া ওর মধ্যে তেমন কোনও চার্ম নেই।

আমার আছে?

আছে। পায়েল হেসে কুটিকুটি হল। কাল রাতে ডিনারের পর দেখি অনির্বাণ প্রায় ড্রাংক। কী বলছিল জানো? শ্রুতি একজন রং ম্যানকে বেছে নিয়েছে দেখে ওর নাকি খারাপ লাগছে।

দীপক প্রপাতের ধারে একটা পাথরের ছোট্ট চাতালে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। সেখান থেকে উঠে এসে বলল, পায়েলদি, বড্ড বেশি ভিড় হয়ে যাচ্ছে এখানে। চলুন! আমরা ডাইনোসরের ছবি দেখতে যাই।

ঠিক বলেছ। তবে তোমার বউয়ের দিকে লক্ষ্য রাখো। ওই দেখ কুমকুম আমার বরের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে।

দীপক হেসে উঠল। তার চেয়ে ফানি ব্যাপার আপনার চোখে পড়ছে না পায়েলদি!

কী বলো তো?

চমনলালজি এ বয়সেও অসাধারণ রোমান্টিক। ওই দেখুন, উনি রজনী দেবীকে নিয়ে নিভৃতে প্রেমালাপ করছেন!

পায়েল চোখ পাকিয়ে বলল, ইউ নটি বয়! গুরুজনদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নেই।

চমনলালজি ঠিক গুরুজনটাইপ নন! আপনার সঙ্গে কেমন জমিয়ে নাচ-ছিলেন!

তোমার সঙ্গেও নাচতে আমার আপত্তি ছিল না!

দীপক শ্রুতির দিকে তাকাল। আপনারও শরীর খারাপ নাকি শ্রুতিদি?

পায়েল বলল, না। মন খারাপ। সোমক এল না! তো দীপক তুমি শ্রুতির মন ভালো করে দাও। আমি তোমার কচি বউকে প্রটেকশন দিই ততক্ষণ।

পায়েল অনির্বাণের কাছে গেল। দীপক বলল, পায়েলদি অদ্ভুত মহিলা! সব সময় হাসিখুশি এবং স্মার্ট থাকতে পারেন। তা শ্রুতিদি, সত্যি আপনাকে যেন মনমরা দেখাচ্ছে।

শ্রুতি উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, শি ইজ ওভারস্মার্ট। আপনি জানেন কি না জানি না ও মডেলিং করত বিজ্ঞাপনে। এখন করে কি না জানি না।

শ্রুতিদি! আমাকে 'তুমি' বললে ভালো লাগবে।

শ্রুতি আস্তে বলল, আচ্ছা দীপক, আমাদের হনিমুনারদের মধ্যে আমার হাজব্যাণ্ড ছাড়া আরও দুজন এখানে আসেনি লক্ষ্য করেছ?

হ্যাঁ। কিন্তু ওঁরা তো আমাদের সঙ্গে মেশেননি। কোথা থেকে এসেছেন— নামটাম কিছুই জানি না। কাল রাতে লক্ষ্য করেছি, ওঁরা চুপচাপ লাউঞ্জে বসে ছিলেন। দীপক সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, আমি কিন্তু আপনার সামনে স্মোক করছি। কিছু মনে করবেন না যেন।

মনে করার কী আছে? শ্রুতি ঠোঁটের কোণে হাসল। তুমি আমার সামনে ড্রিঙ্ক করেছ। নেচেছ। স্মোকও করেছ। এখন হঠাৎ এ কথা কেন?

ওঃ শ্রুতিদি! সে তো পার্টিতে। এখানে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একটু ভদ্রতা মেনে চলতে হয়।

ভ্যাট। আমি ওসব মানি না। তুমি দেখে থাকবে আমার হাজব্যাণ্ড চেইন স্মোকার।

দীপক সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, অনির্বাণদা তো আপনার পরিচিত?

হ্যাঁ। আমার দাদার বন্ধু। সেই সূত্রে চেনাজানা আছে। কেন এ কথা?

ওঁকে কোথায় যেন দেখেছি! ঠিক মনে করতে পারছি না।

কথাটা ওঁকেই জিজ্ঞেস করতে পারো।

দীপক প্রপাতের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, আরে! দেখুন তো শ্রুতিদি, সেই ভদ্রলোক কি না? কাল রাতে ককটেলপার্টির সময় লাউঞ্জের এক কোণে সস্ত্রীক বসে ছিলেন। হ্যাঁ—মনে হচ্ছে তিনিই বটে!

কোথায়?

ফল্‌সের ওপরে পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রুতি দেখে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। তিনিই মনে হচ্ছে।

কিন্তু একা!

ওঁর স্ত্রী আশেপাশে কোথাও আছেন নিশ্চয়।

উনি চলে গেলেন হঠাৎ! ওঁর মিসেসকে কোথাও দেখছি না।

শ্রুতি একটু হাসল। কাউকে খুঁজতে এসেছিলেন সম্ভবত! ম্যানেজার রঘুবীর বলছিলেন না? হনিমুনাররা অনেক সময় বউকে হারিয়ে ফেলে!

ভদ্রলোক খুব রসিক। গত অক্টোবরে বউবদলের গল্পও বলছিলেন।

এই সময় অনির্বাণ মুখের কাছে দু হাতে চোঙ বানিয়ে চিৎকার করে বলল, হারি আপ ফ্রেণ্ডস। এবার আমরা ডাইনোসর দেখতে যাব।

শ্রুতি নড়ে উঠল। মাই গুডনেস! ক্যামেরার কথা ভুলেই গেছি। এক মিনিট। কয়েকটা ছবি তুলে নিই।

সে ক্যামেরা তৈরি করে জলপ্রাতের কয়েকটা ছবি তুলল। তারপর বলল, দীপক ! তুমি আমার জন্য প্লিজ একবার শাটার টেপো ! আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। দেখবে, ছবিতে যেন আমি একা থাকি। ব্যাকগ্রাউণ্ডে ফল্‌স্‌। আর ওই ওপরের টিলার গাছটা।

দীপক ক্যামেরা নিল। শ্রুতি পোজ দিয়ে দাঁড়াল। জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। ছবি তুলে দীপক বলল, আমার ক্যামেরা কুমকুমের কাছে। আসলে ভিড়ভাট্টা দেখে ছবি তুলতে ইচ্ছে করছিল না। এক মিনিট ! ওকে ডাকি।

শ্রুতি বলল, কেন ? আমি তোমার ছবি তুলে রাখছি ! ঠিকানা দিলে পাঠিয়ে দেব। নাকি বউকে পাশে নিয়ে ছবি তুলবে ?

থাক। অনির্বাণদা তাড়া দিচ্ছেন।

শ্রুতি দ্রুত দীপককে ক্যামেরাবন্দি করল। তারপর বলল, ওই দেখ, তোমার বউয়ের হাত ধরে অনির্বাণদা নিয়ে যাচ্ছেন। সীতাহরণের সিন ! তাই না ?

দীপক জিভ কেটে বলল, ছিঃ ! অনির্বাণদা রাবণ নন।

শ্রুতি পা বাড়িয়ে বলল, সাবধান দীপক ! কচি বউটিকে হারিয়ে ফেলো না।

দীপক হাসতে হাসতে ওকে অনুসরণ করল। অনির্বাণ লম্বা পা ফেলে পাথরের ধাপ ডিঙিয়ে উঠছে। কুমকুমের একটা হাত তার হাতে। কুমকুম একটু নাকাল হচ্ছিল অবশ্য। পায়েল চমনলাল দম্পতিকে পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিল। চমনলালজি হঠাৎ ঘুরে এসে ব্রেকফাস্টের আবর্জনাগুলো কুড়িয়ে একটা আবর্জনা-পাত্রে ফেলে দিলেন। পাত্রটা একটা বড় ড্রাম। সেটার গায়ে লেখা আছে, 'প্লিজ ইউজ মি !'

দীপক গিয়ে বলল, সরি চমনলালজি ! আমাদের খেয়াল ছিল না !

চমনলাল সহাস্যে বললেন, নেভার মাইণ্ড ! আপনারা চলুন ! ধাপ বেয়ে উঠতে আমি একটু সময় নেব। রজনী ! তুমি এগোও !

রজনী দেবী মুচকি হেসে ডাকলেন, পায়েল ! তুমি আমার হাজব্যাণ্ডকে রাতারাতি যুবক করে তুলেছিলে। আবার ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ওকে সামলাও।

পায়েল রজনী দেবীর হাত ধরে টানল। চলে আসুন দিদি ! আমরা ওঁকে ফেলে গেলে উনি আবার যুবক হতে বাধ্য হবেন।

রজনী দেবী স্বামীকে বলে গেলেন, তুমি ভালো করে হাত ধুয়ে নেবে কিন্তু। আবর্জনা ঘেঁটেছ।

ওপরের দিকটায় বিশাল বিশাল গাছ। তার ভেতর একটা পুরনো সরকারি বাংলো। দেখতে হানাবাড়ির মতো। প্রাঙ্গণে আগাছার সঙ্গে ফুলের ঝোপ মিশে আছে। একপাশে মোরাম রাস্তায় জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। অনির্বাণ ড্রাইভারকে খুঁজছিল। কুমকুম দীপককে বলল, জানো না তুমি কী মিস করলে!

দীপক কিছু বলার আগেই শ্রুতি বলল, তোমাকে মিস করল বেচারা!

না শ্রুতিদি! অনির্বাণদা বলছিলেন, এই পোড়ো বাংলোয় ভূত আছে। এখানে আমরা একটা রাত কাটিয়ে গেলে দারুণ হয়। তাই না?

দীপক বলল, তার চেয়ে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে একটা করে ভূত খুঁজলে পেয়ে যাব!

তার মানে? কুমকুম ভুরু কুঁচকে তাকাল। তোমার কথাবার্তা মাঝেমাঝে অদ্ভুত লাগে।

শ্রুতি বলল, কুমকুম! তোমার বর একটু জেলাসটাইপ। জানো? আমি ওকে করতলগত করতে চাইছিলাম। বাট আই ফেল্ড্।

কুমকুম বলল, লক্ষ্য করেছি আপনি দীপকের ছবি তুলছিলেন।

এবং দীপক আমার।

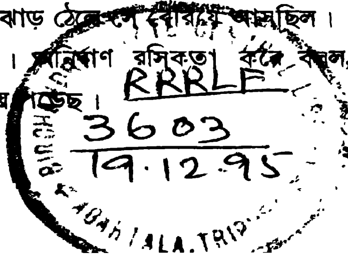
বলে শ্রুতি দীপকের কাঁধে হাতের চাপ দিল। আস্তে বলল, বড্ড শক্ত। হজম করা যাবে না। কিন্তু সাবধান! পায়েলদি একে—

পায়েল জিনিসপত্র গুছিয়ে জিপে তুলছিল। তার কথার ওপর বলল, শ্রুতি! আমার নামে কী যেন রটাচ্ছ! ওদিক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে।

এইসব হাসিপরিহাসের মধ্যে চমনলালজি এসে গেলেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। দীপক বলল, আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে লালজি।

চমনলাল বললেন, আমার ছড়িটা আনতে ভুলে গেছি। খেয়াল থাকে না। বছর বছর আমার শরীরের শক্তি কমে যাচ্ছে। যাই হোক, গুহাচিত্র দেখতে গেলে আর দেরি করা ঠিক নয়। বেলা যত বাড়বে, হুজুগে লোকেদের ভিড় তত বেড়ে যাবে।

অনির্বাণ জিপের ড্রাইভারকে এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছিল। সে জৈবকৃত্যে গিয়েছিল। নীচের দিকে প্রপাত যেখানে একটা হ্রদ সৃষ্টি করেছে, সেদিক থেকে ঝোপঝাড় ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসছিল। হ্রদের দুই তীরই দুর্গম এবং ঘন জঙ্গলে ঢাকা। অনির্বাণ রসিকতা করে বলল, রাম সিং! আমি ভাবছিলাম তুমি বাঘের পাল্লায় পড়েছ।



ড্রাইভার রাম সিংকে কেমন হতচকিত দেখাচ্ছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বড়াসাব! আমার মনে হচ্ছে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাকসিডেন্ট! কী অ্যাকসিডেন্ট?

কথাটা কানে যেতেই হনিমুনাররা তার কাছে এগিয়ে এল। রাম সিং নার্ভাস মুখে বলল, আমার চোখের ভুল হতেও পারে। তবে আমি যেন একটা লাশ দেখতে পেলাম। ফল্‌সের দিক থেকে এসে লেকের মধ্যে একটা পাথরে আটকে-ছিল। তারপর ভেসে গেল।

সবাই হইচই করে বলল, কোথায়? কোথায়?

রাম সিং আঙুল দিয়ে নীচে যেদিকটা দেখাল, সেখানে ঘন জঙ্গল। লেকটা দেখা যায় না। দীপক বলল, কই! চলো তো দেখি!

অনির্বাণ বলল, দীপক! আমরা এখানে দুর্ঘটনা দেখতে আসিনি। শুনেছি, ফল্‌স্ দেখতে এসে অত্যুৎসাহী কেউ পা হড়কে পড়ে যায়। তো যদি কেউ পড়ে গিয়ে থাকে, সে আমাদের দলের কেউ নয়। তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমাদের জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।

পায়েল বলল, অনির্বাণ ঠিক বলেছে। হনিমুন এবং সাইটসিইংয়ে এসে অন্য কোনও ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হবে না।

রজনী দেবী বললেন, রাম সিং! তুমি কি ঠিক দেখেছ?

রাম সিং বিব্রতভাবে বলল, আমার মনে হল মাঈজি!

পুরুষ না মেয়ের লাশ?

চমনলাল একটু চটে গিয়ে বললেন, রাম সিং নিশ্চিত নয়। যা দেখেছে, তা লাশ না অন্য কিছু—

তাঁর কথার ওপর অনির্বাণ তাড়া দিয়ে বলল, জিপে ওঠ সবাই। আমাদের প্রোগ্রাম ভেস্তে যাওয়া ঠিক নয়। হারি আপ!

চুপচাপ দলটি জিপে উঠল। অনির্বাণ এবং চমনলাল সামনে বসলেন আগের মতো। বাকি সবাই পেছনে। জিপ স্টার্ট দিলে শ্রুতি বলল, ফল্‌সের ওপর থেকে কেউ পড়ে গেলে আমরা টের পেতাম। আরও কত লোক তো ছিল। কারও চোখে পড়ত। হইচই শুরু হত। তাই না পায়েলদি?

পায়েল বলল, ছাড়ো তো! রাম সিং কী দেখতে কী দেখেছে।

কুমকুম বলল, ডাইনোসরের গুহাটা কত দূরে?

রজনী দেবী একটু হাসলেন। কাছেই। তবে গুহায় ডাইনোসর নেই। ছবি

আছে নাকি। আমার স্বামীকে প্রাচীন ইতিহাস ভূতের মতো পেয়েছে। উনি কাগজওয়ালাদের খবর নিয়ে মাথা ঘামান। সরেজমিন পরীক্ষা করতে ছোটেন। বাতিক!

পায়েল বলল, আমার ধারণা কেউ চালাকি করে সম্প্রতি ছবিটা এঁকে রেখেছে।

কুমকুম সায় দিয়ে বলল, সোমকবাবু ঠিক একথাই বলছিলেন। তাই না শ্রুতিদি?

শ্রুতি কিছু বলল না। পায়েল বলল, শ্রুতি! তোমরা কি ঝগড়াঝাঁটি করেছ?

রাস্তা বলতে কিছু নেই। তাই জিপটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছিল। শ্রুতি পায়েলের দিকে তাকাল। কিন্তু টালমাটাল অবস্থার দরুণ তার কথা বলতে ইচ্ছে করল না। এক জায়গায় জিপ এমনভাবে কাত হল যে টাল সামলাতে সে দীপককে আঁকড়ে ধরল। জিপ আবার সোজা হলে পায়েল বলল, কুমকুম! এবারও একটা বউবদলের চান্স আছে। তোমার বর সম্পর্কে সাবধান কিন্তু!

শ্রুতি চটে গিয়ে ইচ্ছে করেই দীপকের কাঁধে হাত রাখল। এই সময় জিপটা থেমে গেল। রাম সিং বলল, এখানেই নেমে হেঁটে যেতে হবে সাব! আর গাড়ি চলার রাস্তা নেই।

অনির্বাণ নামল। তারপর চমনলালজি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেমে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে হনিমুনাররাও নেমে দাঁড়াল। পায়েল বলল, কোথায় সেই গুহা?

সামনে উঁচু পাহাড়। কোনওটা ঘাসে বা জঙ্গলে ঢাকা, কোনওটা নগ্ন। চমনলাল পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা কাটিং বের করে মিলিয়ে দেখছিলেন। একটু পরে বললেন, একটা ম্যাপ ছেপেছিল সানডে এক্সপ্রেস। কিন্তু এটা থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাম সিং! তুমি তো স্থানীয় লোক। ছবি আঁকা গুহাটা কোথায় জানো?

রাম সিংকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সে আস্তে বলল, আমার মালিক গত মাসে এসেছিলেন সার! আমি ওঁর সঙ্গে যাইনি। আর একটা কথা স্যার! এসব পাহাড়ে অজগর সাপের উপদ্রব আছে।

অনির্বাণ একটু এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বলল, রমেশ পাণ্ডেও বলছিলেন পাইথনের কথা। কিন্তু ওঁর কথামতো গুহাটা সহজেই চোখে পড়ে। কারণ গুহামুখে সব জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। এক মিনিট। আমি খুঁজে বের করছি।

পায়েল মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে বলল, পাইথন সাপ নাকি সাংঘাতিক। মানুষ গিলে খায়। তোমরা যে যাবে যাও। আমি যাচ্ছি না।

অনির্বাণ তার কাঁধে ঝোলানো কিটব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইণ্ডার বের করে পাহাড়গুলো দেখছিল। হঠাৎ বলল, একটা লোক কাঠের বোঝা মাথায় নেমে আসছে। ওকে জিজ্ঞেস করা যাক।

সবাই মিলে লোকটার প্রতীক্ষা করতে থাকল। লোকটাকে খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সামনেকার টিলার জঙ্গল থেকে সে বেরিয়ে এল। একজন আদিবাসী প্রৌঢ়। তার মাথায় চেলাকাঠের বোঝা। কাঁধে একটা কুড়ুল। সে দলটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অনির্বাণ হিন্দিতে বলল, এই যে ভাই। ওখানে একটা গুহায় ছবি আঁকা আছে। তুমি গুহাটা চেনো?

লোকটা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, ওটা আমাদের দেবতার থান সায়েব! আমরা ওখানে আর কাকেও যেতে দিচ্ছি না। তবে আপনারা টাকাকড়ি দিলে অন্য কথা।

অনির্বাণ বলল, নিশ্চয় দেব। কত দিতে হবে বলো?

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, ওই যে পিপুলগাছ দেখছেন, ওখানে আমাদের সর্দার বসে আছে। তার সঙ্গে কথা বলুন।

পিপুলগাছটা সামনেকার টিলার গায়ে এবং সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের ফাঁকে ঝোপ গজিয়ে আছে। দলটি উৎসাহে এগিয়ে চলল। রাস্তা নেই। রজনী দেবী তাঁর স্বামীকে বললেন, তুমি কি উঠতে পারবে? ছড়িটা তো ফেলে এসেছ!

শুনতে পেয়ে অবির্বাণ বলল, আমি একটা ডাল ভেঙে ছড়ি বানিয়ে দিচ্ছি।

চমনলাল বললেন, না। দরকার হবে না। আপনারা এগোন। আমি আস্তে-সুস্থে এগোচ্ছি। তারপর একটু হাসলেন বৃদ্ধ ঐতিহাসিক। এবার আমি কিন্তু আমার স্ত্রীকে পাশে রাখতে চাই।

সবাই হেসে উঠল। রজনী দেবী বললেন, গুহাচিত্র স্বচক্ষে দেখার কী দরকার? এরা ক্যামেরা এনেছে। তুমি ছবি পেয়ে যাবে।

অনির্বাণ একটা পাথরে উঠে বলল, হারি আপ! লাঞ্চের আগে ফিরতে হবে, মাইণ্ড দ্যাট!

ওরা তাকে একে-একে অনুসরণ করল। ঝোপজঙ্গলের আড়ালে দলটি অদৃশ্য হওয়ার পর রজনী দেবী বললেন, তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে লাল!

চমনলাল খুব আস্তে বললেন, রজনী! ড্রাইভার রাম সিং বলছিল লেকে একটা লাশ দেখেছে। এদিকে আমি আবর্জনার পাত্রে একটা সাংঘাতিক জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি!

রজনী ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, কী?

চমনলাল একটু তফাতে জিপের দিকে তাকিয়ে রাম সিংকে দেখে নিলেন। সে জিপের গায়ে হেলান দিয়ে খৈনি ডলছে। চমনলাল বললেন, পেপারকাপগুলো ফেলতে গিয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম খেলনা। কিন্তু সন্দেহ হল। তুলে নিয়ে বুঝলাম খেলনা নয়।

আহ্! জিনিসটা কী?

একটা ছোট্ট ফায়ার আর্মস। ওজন আছে।

সর্বনাশ! ওখানে ফায়ার আর্মস ফেলল কে?

চমনলাল বললেন, এদিকে এস। আড়ালে বসে পরীক্ষা করে দেখি। ফায়ার আর্মস সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান আছে।

দুজনে একটা ঝোপের ধারে গেলেন। চারদিক দেখে নিয়ে চমনলাল কোটের ভেতর পকেট থেকে রুমালে জড়ানো আগ্নেয়াস্ত্র বের করলেন। বললেন, আঙুলের ছাপ যাতে না পড়ে, তাই রুমাল দিয়ে তুলে নিয়েছিলাম। দেখা যাক বুলেটকেসের কী অবস্থা!

রুমালে আঙুল জড়িয়ে বুলেটকেস খুলে চমনলাল বললেন, সিক্স রাউণ্ডার পয়েন্ট টোয়েন্টিটু ক্যালিবার রিভলভার। একটা বুলেট ফায়ার করা হয়েছে। ও মাই গড! রাম সিং তা হলে ঠিকই দেখেছে।

রজনী দেবী ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, ওটা এখনই কোথাও ফেলে দাও।

নাহ্! আমার নাগরিক দায়দায়িত্ব আছে। তুমি জানো আমি কেমন মানুষ।

কিন্তু এটা মার্ডার-উইপন লাল!

সেইজন্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ। তুমি সতর্ক হও। কোনওভাবে মুখ ফসকে যেন—

না না! রজনী দেবী দ্রুত বললেন। কিন্তু তুমি এখনই ওটা লুকিয়ে ফেলো।

॥ চার ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটু ঝুঁকে লাল রঙের ছিটেগুলো আতস কাঁচে খুঁটিয়ে দেখার পরও নিশ্চিত হতে পারেননি, জিনিসটা রক্ত কি না। পাথরটা মসৃণ এবং বেলে পাথর। এখানেই ফাদার পিয়ার্সন নাকি একটা পার্কমতো করেছিলেন। তার কোন চিহ্ন আর নেই। শুধু এই পাথরটা ছাড়া। নদীটা ফুটতিনেক নীচে। প্রপাতের জলাশয় থেকে মাটি ক্রমশ ঢালু হতে হতে দূরে সমতলে নেমেছে। তাই স্রোত বইছে প্রচণ্ড বেগে। নদীগর্ভে ডুবো পাথর থাকার দরুন জলোচ্ছ্বাসপূর্ণ আর আবর্তসঙ্কুল। নদীতে কেউ পড়ে গেলে তার বাঁচার আশা নেই, তা সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন।

কিন্তু লাল রঙের ছিটেগুলো এখনও জ্বলজ্বল করছে। রক্ত বা রঙ যা-ই হোক ওগুলো টাটকা।

নীল সারসদম্পতির কথা ভুলে গেলেন কর্নেল। এ মুহূর্তে সোমক চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করা জরুরি।

হনিমুন লজের দিকে উঠে যেতে যেতে নিজের এই আচরণের প্রতি বিরক্ত হচ্ছিলেন কর্নেল। কিন্তু এখন তাঁর ভূতগ্রস্ত দশা। মাঝেমাঝে বাইনোকুলার তুলে তিনি তখনও ঋতুপর্ণাকে খুঁজছিলেন। শেষবার খোঁজায় সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জঙ্গলের ফাঁকে এক মুহূর্তের জন্য সুভদ্রা দেবীকে দেখতে পেলেন। ভদ্রমহিলা ব্রেকফাস্টের পর আবার জলপ্রপাতের দিকে চলেছেন। বহু মানসিক রোগীর অবচেতনায় কোনও বিষয়ে একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফিক্সেশন'।

ডাইনিংয়ে সোমক একা। ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ। সে সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ বন্ধ। রিসেপশন কাউণ্টারে রঘুবীর নেই। সিদ্ধেশ নামে এক কর্মচারী খবরের কাগজ পড়ছে। কর্নেলকে একবার সে দেখে নিয়ে কাগজে মন দিল। কর্নেল সোমকের টেবিলের সামনে গিয়ে আস্তে বললেন, বসতে পারি?

সোমক তাকাল। নির্লিপ্ত মুখে বলল, পারেন। তবে সব টেবিলই খালি আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, কিছুক্ষণ আগে আমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি।

আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। ইজ ইট?

থ্যাটস রাইট মিঃ চ্যাটার্জি !

কর্নেল বসলেন। সোমক বলল, আমাকে আপনি চেনেন মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে এখানে এই প্রথম দেখছি। আমাদের মধ্যে অবশ্য আলাপ-পরিচয় হয়নি। কে আপনি ?

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিতে গেলে সোমক বলল, থ্যাঙ্ক্স্। ম্যানেজারের কাছে শুনেছি আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। আপনার নেমকার্ডের দরকার আমার নেই।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, আমি একজন নেচারিস্ট্। প্রকৃতি সম্পর্কে আমার প্রচুর আগ্রহ আছে।

বেশ তো !

আপনি—মানে আপনারা কিছুক্ষণ আগে নদীর ধারে বসে ছিলেন। আপনার সঙ্গিনী কোথায় গেলেন ?

সোমক আগের মতোই নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে বলল, আপনি নেচারিস্ট। প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার নাকি আগ্রহ আছে। তো হঠাৎ আমাদের সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কী জানতে পারি ?

আপনারা নদীর ধারে যে পাথরটার ওপর বসে ছিলেন, সেখানে এইমাত্র একটু রক্ত দেখে এলাম।

সোমক এবার একটু চমকে উঠল। রক্ত ?

সম্ভবত।

আপনি কী বলতে চাইছেন ?

কিছু না। এবার যা বলার তা আপনিই বলুন !

ননসেন্স ! ঋতুপর্ণার সঙ্গে আজ মর্নিংয়ে আমার আলাপ হয়েছে। তাকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। নদীর ধারে গল্প করার ছলে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সোমক উত্তেজনা দমন করে শ্বাস ছাড়ল। ফের বলল, কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ উঠে গেল।

কোন দিকে গিয়েছিল সে ?

উত্তরে রাস্তার দিকে। সোমক বিকৃত মুখে বলল, আমি অপমানিত বোধ করলাম। একটু বসে থাকার পর চলে এলাম।

আপনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি ?

আই ওয়াজ সো পাজল্ড্—সোমক তীক্ষ্ণদৃষ্টে কর্ণেলের দিকে তাকাল।

এখন আপনি বলছেন ওখানে নাকি রক্ত দেখে এলেন ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনার যদি মনে হয়ে থাকে, আমি মিথ্যা কথা বলছি—তার মানে আমি ঋতুপর্ণাকে মার্ডার করেছি—হাউ ফানি কাউকে মেরে ফেলতে চাইলে ধাক্কা মেরে নীচে নদীতে ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট নয় কি ?

কর্নেল মাথা দোলালেন। দ্যাটস্ রাইট। বাট বাই এনি চান্স—

বলুন !

কেউ ঝোপের আড়াল থেকে ঋতুপর্ণাকে গুলি করলে আপনার পক্ষে তখনই ছুটে পালিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল।

সোমক সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঘষটে নিভিয়ে বলল, আমি মিথ্যা বলেছি, আগে তা প্রমাণের দায়িত্ব আপনার। বাট—হু আর ইউ ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি, ঋতুপর্ণার ভাগ্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটলে আপনার একটা দায়িত্ব থেকে যাবে। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট ?

ইজ ইট এ থ্রেটনিং কর্নেলসায়েব ?

দ্যাট ডিপেণ্ডস।

সোমক উঠে দাঁড়াল। আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। ইউ আর এ ফানি ওল্ডম্যান ! এটা দেখছি আসলে লুনাটিক অ্যাসাইলাম। মিসেস ঠাকুরও আমাকে যত সব আবোলতাবোল কথা বলছিলেন। উনিও আপনার মতো যত্র-তত্র রক্ত বা ডেডবডি দেখতে পান।

কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, আপনার সহযোগিতা চাইছি মিঃ চ্যাটার্জি !

বাট ইউ আর ইমাজিনিং ফানি থিংস !

বলে সোমক সোজা করিডরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকল। কর্নেল রিসেপশনের দিকে ঘুরে বললেন, সিদ্ধেশ ! তোমাদের ম্যানেজার কোথায় ?

সিদ্ধেশ বলল, উনি মার্কেটিংয়ে গেছেন স্যার !

আমি এক পেয়ালা কফি চাইছি সিদ্ধেশ।

সিদ্ধেশ বেরিয়ে এসে কিচেনের দিকে গেল। কর্নেল চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিলেন। সোমক চ্যাটার্জির প্রতিক্রিয়া স্মরণ করতে থাকলেন। তারপর তাঁর মনে হল, রক্ত পড়ে থাকার কথা শুনে সোমকের তখনই নদীর ধারে গিয়ে স্বচক্ষে তা দেখে আসা স্বাভাবিক ছিল। কথাটা শোনামাত্র এটাই এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অথচ সোমক রক্তের কথা শুনে চমকে উঠেছিল ! হুঁ,

সম্ভবত সে কিছু গোপন করেছে।

রিসেপশনের দিকে টেলিফোন বেজে উঠল। সিদ্ধেশ কিচেনে ঢুকে গেছে। কর্নেল দ্রুত উঠে গিয়ে ফোন ধরে সাড়া দিলেন। কেউ ইংরেজিতে বলল, হনিমুন লজ?

হনিমুন লজ।

ম্যানেজার রঘুবীর রায় বলছেন?

উনি বেরিয়েছেন। আপনি কে বলছেন—

চিনবেন না। আপনি—প্লিজ দেখুন তো দোতলায় ৪ নম্বর স্যুইটের কর্নেল সায়েব আছেন কি না?

কর্নেল অবাক হলেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, তাঁকে কি খুবই দরকার?

দিস ইজ আর্জেন্ট।

হুঁ। বলুন!

বলুন মানে? আপনাকে কী বলার আছে? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না কী বলছি?

পাচ্ছি। কিন্তু আপনি কে সেটা জানা দরকার।

ড্যাম ইট! আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। শীগগির দেখুন উনি আছেন কি না।

আছেন। এখানেই আছেন।

তা হলে তাঁকে ফোন দিচ্ছেন না কেন?

কর্নেল এতক্ষণ চাপা কণ্ঠস্বরে কথা বলছিলেন। ফোন একপাশে রেখে দেখলেন সিদ্ধেশ নিজের হাতে কফির কাপপ্লেট আনছে। ইসারায় তাকে একটা টেবিলে কফি রাখতে বলে আবার ফোন তুললেন। ভরাট গলায় সাড়া দিলেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।

কর্নেল সরকার! আমি কে, তা জানাতে চাই না। তবে আপনাকে আমি জানি। ফর ইওর ইনফরমেশন, হনিমুন লজ এরিয়ায় একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ হয়েছে।

মিসহ্যাপ? হোয়াটস্ দ্যাট?

এ মার্ডার।

ফানি! কে কাকে মার্ডার করল?

ধারানগরের কাছে বাঁকের মুখে জেলেরা এইমাত্র একটা ডেডবডি পেয়েছে। পুলিশের কাছে খবর গেছে। ডেডবডিটা আমি দেখামাত্র চিনেছি। ঋতুপর্ণা রায়।

আমার জোক শোনার মুড নেই। আপনি কি তার স্বামী শোভন রায় বলছেন?

শোভন রায়কে আমি চিনি না। তবে ঋতুপর্ণাকে চিনি। আমি কে তা জানতে চাইলে বলব না। আপনি ইচ্ছে করলে এখনই থানায় ফোন করে জেনে নিতে পারেন। ছাড়ছি।

ওয়েট, ওয়েট! ঋতুপর্ণা মার্ডার্ড, তা কী করে বুঝলেন? সে দৈবাৎ নদীতে পড়ে গিয়ে—

তার মাথার পিছনে ক্ষতচিহ্ন আছে কর্নেল সরকার! শি ওয়াজ শট ফ্রম হার ব্যাক।

লাইন কেটে গেল। কর্নেল একটু পরে ফোন রেখে দেখলেন, সিদ্ধেশ তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে বলল, কোথায় কে মার্ডার হয়েছে স্যার?

ধারানগরে। তবে এ কিছু না। কর্নেল একটু হাসলেন। চেপে যাও সিদ্ধেশ! খামোকা পুলিশের হাঙ্গামায় জড়িয়ে লাভ নেই।

কর্নেল কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলেন। সিদ্ধেশ ভয় পাওয়া গলায় বলল, স্যার! আমাদের বোর্ডারদের কেউ নয় তো?

জানি না। আমার এক বন্ধু ধারানগর থেকে ফোন করে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিল।

কর্নেল চেয়ার টেনে বসে কফিতে চুমুক দিলেন। তাঁর ইনট্যুইশন মাঝেমাঝে সক্রিয় হয়ে ওঠে। টেলিফোন বেজে ওঠার পর তিনি কাউন্টারে বেশ জোরে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলেছিলেন অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা যায়। ঋতুপর্ণা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জেগেছিল এবং সিদ্ধেশ বলছিল, শোভন রায় একটু আগে ফোনে ওকে ডেকে দিতে বলেছিল। তাই তিনি শোভন রায়ের ফোন ভেবেই ওভাবে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে ফোন তুলেছিলেন।

সিদ্ধেশ আস্তে বলল, একটা কথা বলব স্যার!

বলো সিদ্ধেশ!

হনিমুন লজের তরুণ কর্মচারীটি একটু ইতস্তত করার পর বলল, রুদ্রসাব ধারানগর থেকে যার জিপ আনিয়েছেন, সেই লোকটার খুব দুর্নাম আছে।

একসময় সে লুঠেরা ডাকু ছিল। পরে পলিটিসিয়ান হয়েছে। বড় বড় অফিসার থেকে মিনিস্টার পর্যন্ত তাকে খাতির করে চলেন। আমার অবাক লেগেছে স্যার ! রুদ্রসাবের সঙ্গে তার ফ্রেণ্ডশিপ আছে।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, নাম কী ?

রমেশ পাণ্ডে। রুদ্রসাব পরশু এখানে এসেছেন। পরশু সন্ধ্যায় রমেশ পাণ্ডে জিপে চেপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে এখানে দেখে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম স্যার !

কেন ?

রমেশ পাণ্ডে লম্পট। কোনও মেয়ের দিকে তার চোখ পড়লেই বিপদ। এদিকে দেখুন, এই লজে এবার সুন্দর সুন্দর সব লেডি এসেছেন। রুদ্রসাবের স্ত্রী—

হুঁ। বলো !

আমার ধারণা মিসেস রুদ্র ফিল্মের হিরোইন। মিঃ রুদ্রের চেয়ে ওঁর বয়স অনেক কম। আমার সন্দেহ ওঁরা বিবাহিত কিনা। কাল অনেক রাতে মিসেস রুদ্র লনে একা বসেছিলেন।

তাতে কী ?

রমেশ পাণ্ডের ফাঁদে মেয়েরা সহজে পা দেয়। বলেই সিদ্ধেশ মুখটা করুণ করল। দয়া করে এসব কথা যেন ম্যানেজারসাবকে বলবেন না স্যার।

বলব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো সিদ্ধেশ ! আর—কফি খাওয়া হলে আমি একটা টেলিফোন করব।

কোনও বাধা নেই স্যার !

সিদ্ধেশ রিসেপশন কাউন্টারে ফিরে গেল। তারপর দুই কানে ওয়াকম্যানের তার গুঁজে গান শুনতে থাকল। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এক তরুণ ড্রপ আউটের পক্ষে এ ধরনের চাকরি আজকাল সুলভ। এরা রিসেপশনিস্ট হিসেবে স্মার্ট এবং বাকপটু। তবে সিদ্ধেশ একটু সরলপ্রকৃতির ছেলে এবং অনুগত—ইংরেজিতে যাকে বলে ওবিডিয়েন্ট।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। তারপর একটু ভেবে নিলেন। ঋতুপর্ণা সংক্রান্ত খবরটা কোনও ফাঁদ নয় তো ? কিংবা কেউ তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে কৌতুক করছে কি ? নদীর ধারে গাছটার তলায় পাথরের ওপর যে লাল রঙের ছিটে দেখে এলেন, তা নেলপালিশ লিপস্টিক বা সিঁদুরও তো হতে পারে !

এখন থানায় ফোন করা ঠিক হবে না। ম্যানেজার রঘুবীর বাজার করতে

গেছে। খবরটা সত্যি হলে এতক্ষণ রটতে দেরি হবে না এবং তার কানে যেতে পারে। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

এই সময় সোমক চ্যাটার্জি নেমে এল। তার হাতে সিগারেট। সে লাউঞ্জ পেরিয়ে গিয়ে দরজার কাছে একটু দাঁড়াল। তারপর লনে নামল। কর্নেল লক্ষ্য করলেন, সে ডানদিকে ঘুরে বাগানে যাচ্ছে।

কর্নেল উঠলেন। তিনি লাউঞ্জের দিকে যাচ্ছেন দেখে সিদ্ধেশ বলল, টেলিফোন করবেন না স্যার?

নাহ্। পরে করব।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, সোমক বাগান থেকে দক্ষিণের গেট খুলে চলে যাচ্ছে। কর্নেল তাকে অনুসরণ করলেন। ধারিয়া ফল্‌সে যাওয়ার পায়ে চলা পথ ওটা। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সোমক ঘুরে দাঁড়াল। রুষ্ট মুখে বলল, কী চান আপনি?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, একটা খবর দিতে চাই। কিন্তু আপনি এমন-ভাবে বেরিয়ে এলেন যে সুযোগই পেলাম না।

বলুন!

কিছুক্ষণ আগে কেউ আমাকে ফোনে জানাল, ধারানগরের কাছে জেলেরা একটা টাটকা ডেডবডি পেয়েছে। মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছে ঋতুপর্ণার।

সোমক প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, হোয়াট?

কেউ আমাকে ফোনে তা-ই বলল। সে ঋতুপর্ণাকে চেনে।

বাট আই ডিড্‌ন্ট্ কিল হার!

আমি তা বলছি না। তাছাড়া এখনও আমি খবরটার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নই। দিস ইজ জাস্ট ফর ইওর ইনফরমেশন মিঃ চ্যাটার্জি!

সোমক জোরে শ্বাস ছাড়ল। একটু পরে বলল, আপনি অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলছেন! ভেরি ব্যাড জোক। অন্য কেউ হলে আপনাকে—

সে থেমে গেল। কর্নেল আস্তে বললেন, আমি আপনার হিতৈষী মিঃ চ্যাটার্জি। খবরটা সত্য হলে আপনি জড়িয়ে পড়বেন। কারণ ঋতুপর্ণাকে শেষ-বার দেখা গেছে আপনারই সঙ্গে। ডুই ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট?

সোমক শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আপনাকে বলেছি। সে কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে চলে গেল। তারপর সে কোথায় গেল কিংবা তার কী হল আমি জানি না।

আমি আপনাদের কথা বলতে দেখেছি প্রায় আটটা পাঁচে।

ঘড়ি দেখিনি। তবে আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তার কতক্ষণ পরে ঋতুপর্ণা হঠাৎ চলে গিয়েছিল?

সোমক ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। বলল, মে বি ফাইভ অর টেন মিনিটস! আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনি ঋতুপর্ণাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন! কে আপনি?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট।

ড্যাম ইট! সোমক আবার উত্তেজিত হল। ঋতুপর্ণাকে আপনি চেনেন এবং সেও আপনাকে চেনে বোঝা যাচ্ছে। আর ইউ এ ডিটেকটিভ!

কর্নেল মাথা নেড়ে এবং জিভ কেটে বললেন, না না মিঃ চ্যাটার্জি! আমার কাছে ওই কথাটা একটা গালাগাল। কারণ বাংলা স্ল্যাং 'টিকটিকি' এসেছে ইংরেজি ডিটেকটিভ থেকে। তবে কোথাও কোন রহস্য দেখলে আমি তার পিছনে নিজেকে লড়িয়ে দিই।

আমার কাছে আপনার রহস্যের কোনও ক্লু নেই। আপনি আমার মানসিক শান্তি নষ্ট করছেন কর্নেল সরকার! তাছাড়া কাল রাত থেকে আমার শরীরও একটু অসুস্থ। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।

কর্নেল ঘুরে লজের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ পিছু ফিরলেন। একটা প্রশ্ন মিঃ চ্যাটার্জি। ঋতুপর্ণা চলে যাওয়ার পর, আমার হিসেবমতো আপনি প্রায় এক ঘণ্টা বা আরও বেশি ওখানে ছিলেন। কেন?

একা বসে থাকতে ভালো লাগছিল। বলে সোমক এগিয়ে গেল। তার পা ফেলার ভঙ্গিতে আড়ষ্টতা ছিল।

।। পাঁচ ।।

চমনলাল এবং রজনী দেবী জিপের কাছে ফিরে এসেছিলেন। ড্রাইভার রাম সিং তখন ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে 'নমস্তে' করল। তারপর বিষণ্ণ-মুখে বলল, রাত থেকে আমার আমাশা মতো হয়েছে সার। কিন্তু মালিকের হুকুম। আমাকেই আসতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে এসেছি। আপনারা ওদের সঙ্গে যাননি?

চমনলাল হাসলেন। দেখতেই পাচ্ছ রাম সিং। আমাদের বয়স হয়েছে। পায়ে হেঁটে চড়াইয়ে উঠতে পারব না।

রজনী দেবী বললেন, আচ্ছা রাম সিং, তুমি লেকে যে লাশটা দেখেছিলে—

চমনলাল স্ত্রীর ওপর চটে গেলেন। আর লাশের কথা নয় রজনী! আমি ক্লান্ত। ফিরে যেতে পারলে বাঁচি!

রাম সিং অন্যমনস্কভাবে বলল, লেকের মাঝখানে স্রোত আছে। লেক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আবার ধারা নদী। লাশটা ওখানে গিয়ে পড়লে বিশ-তিরিশ মিনিটের মধ্যে পাঁচ-সাত কিলোমিটার দূরে চলে যাবে। আমার ধারণা, এতক্ষণ ওটা ধারানগরের কাছে পৌঁছে গেছে।

চমনলাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আমার দুর্ভাগ্য! গুহাচিত্র স্বচক্ষে দেখতে পেলাম না।

রজনী দেবী আস্তে বললেন, আসলে তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছ লাল!

ঠিক বলেছ। আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

লাল! রাম সিংকে বলো না, আমাদের লজে পৌঁছে দিয়ে আসুক। ওঁদের ফিরতে দেরি হতে পারে!

কী বলছ! প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব। ওঁরা দৈবাৎ ফিরে এসে জিপটা দেখতে না পেলে—চমনলাল ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলে ফের বললেন, আমাদের দলে ভেড়া উচিত হয়নি। ইচ্ছেমতো ঘোরা যাচ্ছে না। জলপ্রপাতের ওপরদিকে একটা রোপওয়ে ছিল তোমার মনে পড়ছে রজনী?

রজনী দেবী ম্লান হাসি হাসলেন। মনে পড়ছে লাল! ফাদার পিয়ার্সনের বাংলো থেকে নদীর ওপর দিয়ে শর্টকাটে আমরা আসতাম। রোপওয়েতে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না দেখতাম।

ওঃ! সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!

অথচ দেখ, তখন বুনো জানোয়ারের উপদ্রব ছিল। আমরা গ্রাহ্য করতাম না।

যৌবন মানুষকে দুঃসাহসী করে! তা ছাড়া তুমিও তখন যুবতী। তোমার রূপলাবণ্যে—

শাট আপ! রজনী দেবী তাঁকে থামিয়ে দিলেন। আচ্ছা লাল, সেই রোপওয়ের পিলারটা আসার পথে দেখতে পেলাম না কেন? গত বছরও তো ওটা দেখেছি।

ভেঙে পড়ে গেছে সম্ভবত।

দুই দম্পতি এইসব কথা বলছিলেন। ইতিমধ্যে রাম সিং আবার জৈবকর্ম সেরে এসেছিল। ওর চেহারায় অসুস্থতার আদল ক্রমশ ফুটে উঠছিল। তারপর দলটিকে ফিরতে দেখা গেল। তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। সার বেঁধে ওরা আসছিল। পাথর বেয়ে নামতে পরস্পরকে সাহায্য করছিল।

অনির্বাণ এগিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার চমনলালজী? আমরা আপনার জন্য গুহার মুখে অপেক্ষা করছিলাম!

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক কাঁচুমাচু মুখে বললেন, সম্ভব হলো না। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তো আপনারা কি সত্যি ডাইনোসরের ছবি দেখতে পেলেন?

অনির্বাণ হাসল। গুহার ভেতর ভীষণ অন্ধকার। দেওয়াল কোথাও কোথাও মসৃণ করা হয়েছে। রঙবেরঙের অদ্ভুত-অদ্ভুত ছবি দেখেছি। তবে—

দীপক তার কথার ওপর বলল, ওটা ডাইনোসর, না হাতি বোঝা গেল না চমনলালজি!

সবাই হেসে উঠল। রজনী দেবী বললেন, ড্রাইভারের আমাশা। বেচারাকে শিগগির রেহাই দিলে ভালো হয়।

অনির্বাণ বলল, জানি। রাম সিংকে তো আমি দুটো ট্যাবলেট খেতে দিয়েছিলাম। খাওনি রাম সিং?

খেয়েছি স্যার! কিন্তু কমছে না।

পায়েল বলল, অনির্বাণ! তুমি ওকে গাড়ি ড্রাইভ করতে দিও না। রাস্তা খারাপ।

অনির্বাণ বলল, ওঃ পায়েল! আই অ্যাম ড্যাম টায়ার্ড।

শ্রুতি বলল, রাম সিং ড্রাইভ করতে পারবে না কেন? পেটের অসুখ তো আসার সময় থেকে শুনছি।

কুমকুম চোখে হেসে বলল, বেড়ে গেছে। আবার হয়তো মাঝরাস্তায় গাড়ি থামিয়ে দেবে।

দীপক বলল, তখন আমরা ওকে ফেলে যাব। অনির্বাণদা ড্রাইভ করে আমাদের পৌঁছে দেবেন।

হারি আপ! অনির্বাণ তাড়া দিল। ফিরে গিয়ে স্নান করতে হবে। গুহার ভেতর ঢুকে নোংরা হয়ে গেছি! রাম সিং! তুমি খারাপ রাস্তাটুকু আমাদের পার করে দাও। তারপর বরং আমি ড্রাইভ করব।

সবাই জিপে উঠল। কুমকুমের হাতে একগোছা বুনো ফুল ছিল। জিপ চলতে

শুরু করলে শ্রুতি তাকে বলল, তোমার বরকে গোপনে উপহার দেবে বুঝি কুমকুম ?

দীপক ফুল বোঝে না শ্রুতিদি।

দীপক বলল, অন্তত এই ফুলগুলো বুঝি না ! এই এরিয়ায় যেখানে-সেখানে এই লাল ফুলগুলো ফুটে আছে। পায়েলদি ! অনির্বাণদার শার্টের অবস্থা দেখেছেন ?

পায়েল চটুল হেসে বলল, গুহার ভেতর তোমার বউ ওকে কিংবা ও তোমার বউকে ফুলগুলো প্রেজেন্ট করে থাকবে। অনির্বাণ ইন ডেঞ্জারাস দীপক।

শ্রুতি বলল, অনির্বাণদার হাতে আমি কিন্তু প্রথমে এই ফুলের গোছা দেখেছিলাম। আসবার পথে।

পায়েল বলল, তাহলে সেগুলো এখন কুমকুমের হাতে চলে গেছে।

কুমকুম চ্যাঁচামেচি করে বলল, মোটেও না। এগুলো আমি গুহার কাছে তুলেছি।

শ্রুতি বলল, তাহলে অনির্বাণদার ফুলগুলো কোথায় গেল ?

পায়েল বলল, আমার বরকে আমি অত পাত্তা দিই না। তাই পথে কোথাও ফেলে দিয়েছিল।

দুর্গম রাস্তাটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে এসে জলপ্রপাতের কাছে সুগম হল এবং এবার জিপের গতি পূর্বে। বাঁ দিকে ধারা বা ধারিয়া নদী। সংকীর্ণ পিচ-রাস্তা তার সমান্তরালে এগিয়ে হাইওয়েতে মিশেছে। নদীর দুই তীরেই ঘন জঙ্গল আর পাথর। প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্বে হাইওয়ে। নদী ওখানে সামান্য বাঁক নিয়ে উত্তর-পূর্বে চলে গেছে ধারানগরের দিকে। বাঁকের আগে ব্রিজ। তারপর বাঁদিকে সংকীর্ণ চড়াই রাস্তা ধরে গেলে টিলার মাথায় হনিমুন লজ। এই রাস্তাটা 'প্রাইভেট রোড'। দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ গাছ।

জিপ প্রাইভেট রোডের মুখেই দাঁড় করাল অনির্বাণ। বলল, চমনলালজির অসুবিধা না হলে আমরা এখানেই নেমে যেতে পারি। রমেশকে কথা দিয়েছি, বারোটার মধ্যে জিপ ফেরত দেব।

চমনলাল বললেন, না। অসুবিধা কিসের ? এটুকু পথ হেঁটে যেতে আমার ভালোই লাগবে।

সবাই জিপ থেকে নামল। তারপর রাম সিং জোরে জিপ চালিয়ে উধাও হয়ে গেল। দলটি হনিমুন লজের দিকে পা বাড়াল। শ্রুতি বলল, ও মা ! অনির্বাণদার শার্টের কী বিচ্ছিরি অবস্থা।

অনির্বাণ হাসল। কুমকুমের শাড়ির অবস্থা দেখ।

কুমকুম বুকের কাছে শাড়ির একটা অংশ তুলে আঁতকে উঠল। এ কী! কী অদ্ভুত ফুল!

দীপক বলল, গন্ধ নেই। তাই রঙ ছড়ায়।

চমনলাল বললেন, লাতিন নাম ব্রাসিলিকা ইন্দিকা। আদিবাসীরা কাপড় রাঙানোর জন্য এই ফুলের রঙ ব্যবহার করে। আসলে লক্ষ্য করলে দেখবেন, ফুলের পরাগে লাল রেণু আছে। একটু নড়লেই রেণুগুলো ঝরে পড়ে। রজনী! তোমার মনে আছে? প্রথমবার এখানে এসে দুজনের হোলি খেলার অবস্থা!

রজনী দেবী সায় দিয়ে বললেন, প্রকৃতির খেয়াল! শরৎকালে এরা ফোটে। বসন্তকালে ফোটা উচিত ছিল।

কুমকুম ফুলগুলো রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেলল। বলল, বাজে ফুল! আমার হাত বিচ্ছিরি লাল হয়ে গেছে।

দীপক বলল, মনে হচ্ছে খুনখারাপি করেছ!

পায়েল চোখ পাকিয়ে বলল, তোমার একটুও রসবোধ নেই দীপক! 'রাঙা হাত' টার্মটা তুমি ভুলে যাচ্ছ।

ক্রমে চমনলাল এবং বিজয়া দেবী পিছিয়ে পড়ছিলেন। অনির্বাণ সবার আগে হাঁটছে। টিলার মাটি কেটে এই রাস্তাটাকে যতটা সম্ভব কম চড়াই করা হয়েছে। কলকাতার হনিমুনাররা এগিয়ে গেলে বিজয়া দেবী আস্তে বললেন, কী রকম স্বার্থপর দেখছ লাল?

কেন বিজয়া?

তখনকার মতো আমাদের ফেলে চলে গেল ওরা।

তাতে কী? আমাদের অত তাড়া নেই।

কিন্তু প্রশ্নটা ভদ্রতার। তা ছাড়া আমরা দুজনেই বৃদ্ধ।

শরীরে বিজয়া, শরীরে। মনে নই।

একটু পরে বিজয়া দেবী বললেন, আচ্ছা লাল, কখন থেকে কথাটা মনে আসছিল, বলতে ভুলে গেছি। কলকাতা থেকে আসা বাঙালি হনিমুনারদের মধ্যে সেই দম্পতির আচরণ অদ্ভুত নয়? ওরা এদের সঙ্গে মেশেনি। কাল রাতের পার্টিতেও ওরা দুটিতে তফাতে বসেছিল।

সবাই হইহল্লা পছন্দ করে না। ওরা আলাদা থাকতে চেয়েছে।

কিন্তু—

কিন্তু কী ?

ওরা পায়ে হেঁটে শর্টকাটে গেলে ধারিয়া ফলসের ওপর দিকটায় পৌঁছুতে পারে। তাই না লাল ?

তুমি কী বলতে চাইছ বিজয়া ?

বিজয়া দেবী জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, ড্রাইভার রাম সিং ধারিয়া লেকে একটা লাশ ভেসে যেতে দেখেছে।

চমনলাল থমকে দাঁড়ালেন। তুমি কেন ভাবছ—

তাঁর কথার ওপর বিজয়া দেবী বললেন, আমাদের পাশের স্যুইটে ওরা উঠেছে। কাল রাতে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি কানে আসছিল। তারপর আজ খুব ভোরে দরজা খোলার শব্দ শুনেছি। শব্দটা জোরালো। যেন রাগ করে কেউ বেরিয়ে গেল !

ওঃ বিজয়া ! তুমি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব কল্পনা করো !

কল্পনা নয়, লাল। আমি সত্যি শুনেছি।

চমনলাল হাসলেন। তুমি কি বলতে চাও, এই খুদে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে যুবকটি তার স্ত্রীকে খুন করে প্রপাতে ফেলে দিয়েছে ? বিজয়া ! বোকার মতো কথা বোলো না। কেউ কাকেও মেরে ফেলতে চাইলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট। তবে প্রপাতের ওপরদিকে আজ মানুষজন কম ছিল না।

বিজয়া দেবী একটু পরে বললেন, এমন হতে পারে নীচের দিকে—মানে লেকের কাছাকাছি। কোথাও মার্ডার করে জলে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু অস্ত্রটা আমি পেয়েছি আবর্জনার পাত্রে। পাত্রটা ছিল ফলসের নীচে অন্য পারে। রোপওয়েটা আর নেই যে সে নদী পেরিয়ে অস্ত্রটা ওখানে ফেলে আসার সুযোগ পাবে। চমনলাল পা বাড়ালেন। ফের বললেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, হত্যার অস্ত্র জলে না ফেলে আবর্জনার পাত্রে ফেলল কেন সে ?

তুমি বুঝতে পারছ না লাল ! সে হত্যার দায় নিশ্চয় অন্যের কাঁধে চাপাতে চেয়েছে।

তাহলে—যদি সত্যিই একটা খুনখারাবি হয়ে থাকে, সেটা হয়েছে ধারা নদীর ওপারে। যেপারে আমরা ছিলাম।

অস্ত্রটা তোমার কাছে আছে। আমার ভয় করছে লাল ! এখনও সুযোগ আছে। ওটা ফেলে দাও কোথাও।

বিজয়া! তুমি জানো আমি আজীবন সৎ নাগরিক। আমার সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রখর।

সে যুগ আর নেই লাল! তুমি ফেঁসে যাবে বলে দিচ্ছি।

স্যুইটে ফিরে আমাকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।

বিজয়া দেবী হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে বললেন, আরে! মিসেস ঠাকুর ওখানে কী করছেন?

কৈ? কোথায়?

ওই দেখ। নদীর ধারে সেই বেদিটার কাছে।

চমনলাল ক্লান্তভাবে হেসে বললেন, আমাদের মতো ওঁরও কিছু স্মৃতি আছে। ফাদার পিয়ার্সনের পার্কের ওটাই শেষ চিহ্ন। আশ্চর্য ব্যাপার রজনী! বেদিটার পাশে একটা গাছ কত দ্রুত বেড়ে উঠেছে। ওখানে কোনও গাছ ছিল না।

দুজনে আবার হাঁটতে থাকলেন। দুধারে ঘন শ্রেণীবদ্ধ গাছ থাকায় প্রাইভেট রোড ছায়াচ্ছন্ন। হনিমুন লজের গেটের কাছে পৌঁছে বিজয়া দেবী আস্তে বললেন, আচ্ছা লাল! ওই কর্নেল ভদ্রলোককে দেখতে কতকটা ফাদার পিয়ার্সনের মতো তাই না?

ঠিক ধরেছ। আমি প্রথমে তো চমকে উঠেছিলাম ওঁকে দেখে। উনিও একজন প্রকৃতিপ্রেমিক।

কিন্তু উনি যেন আমাদের এড়িয়ে চলেছেন। কেমন রহস্যময় মানুষ যেন!

চমনলাল হাসলেন। মেয়েদের চোখ একটু অন্যরকম হয়তো। আমার তা মনে হয়নি। ম্যানেজার রঘুবীর বলছিল, উনি গত অক্টোবরেও এখানে এসেছিলেন। আমরা তখন চলে গেছি। প্রকৃতি সম্পর্কে ওঁর নাকি অদ্ভুত বাতিক আছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে দুজনেই ঘুরে দাঁড়ালেন। সুভদ্রা ঠাকুর হনহন করে আসছিলেন। তাঁদের পাশ কাটিয়ে লনে ঢুকে গেলেন। তারপর বারান্দায় উঠে একই গতিতে লজের ভেতর অদৃশ্য হলেন।

বিজয়া দেবী বললেন, ভদ্রমহিলা আঁচলের ভেতর দু'হাতে কী যেন লুকিয়ে নিয়ে গেলেন!

শি ইজ লুনাটিক! ওঁকে এড়িয়ে চলাই উচিত।

লাউঞ্জের কোণে রিসেপসন কাউন্টারে সিদ্ধেশ ওয়াকম্যানে গান শুনছিল। বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখে একটু হাসল শুধু। লাউঞ্জের কোণে দুজন গুঁফো অচেনা লোক

বসে আছে। কিন্তু ডাইনিং হল ফাঁকা। চমনলাল বললেন, তুমি চলো বিজয়া। আমি যাচ্ছি।

বিজয়া দেবী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন।

কাউন্টারের সামনে চমনলালকে দেখে সিদ্ধেশ কান থেকে ওয়াকম্যান খুলে বলল, ক্যান আই হেল্প ইউ সার?

চমনলাল বললেন, ধন্যবাদ সিদ্ধেশ! তোমার ম্যানেজার কোথায় গেল?

ম্যানেজার সাব আবার বেরিয়েছেন সার! একটা মিসহ্যাপ হয়েছে!

মিসহ্যাপ? কোথায়?

আপনাদের পাশের স্যুইটের ভদ্রমহিলার ডেডবডি পাওয়া গেছে। ধারানগরের কাছে জেলেরা দেখতে পেয়েছিল। সিদ্ধেশ নির্বিকার মুখে বলল। তারপর একটু হাসল। হনিমুনারদের মধ্যে খারাপ লোক তো থাকে সার!

চমনলাল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শক্ত হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, ভদ্রমহিলার স্বামী?

তাঁর পাত্তা নেই। ম্যানেজারসাবের সঙ্গে পুলিস এসেছিল একটু আগে। ওঁদের স্যুইট সিল করে গেছে পুলিস।

কী নাম ভদ্রমহিলার?

ঋতুপর্ণা রায়। ওঁর স্বামীর নাম শোভন রায়।

হনিমুনাররা এ খবর শুনেছে?

জগদীশের কাছে শুনল। তারপর চুপচাপ নিজেদের স্যুইটে চলে গেল। সিদ্ধেশ আস্তে বলল, পুলিস আমাকে জেরা করেছিল। আমাদের স্টাফদের সবাইকে করেছে। আমরা কেউ কিছু জানি না। তবে পুলিস আবার আসতে পারে।

আমাদের জেরা করতে?

সম্ভবত।

চমনলাল নীচের তলায় তাঁর স্যুইটের দিকে এগিয়ে গেলেন। করিডরে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে দেখা হল। কর্নেল বললেন, নমস্তে মিঃ লাল!

নমস্তে। চমনলাল একটু ইতস্তত করার পর বললেন, একটা মিসহ্যাপ হয়েছে শুনলাম। সিদ্ধেশ বলল।

আপনারা কেমন ঘুরলেন বলুন?

একই জায়গা। তত কিছু নতুনত্ব দেখলাম না।

ডাইনোসরের ছবি তো নতুনত্ব, মিঃ লাল!

আমি দেখতে যাইনি। পাহাড়ে ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। সস্ত্রীক নীচে অপেক্ষা করছিলাম। চমনলাল পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন! কর্নেলসাব! শুনলাম পুলিস একদফা লজের কর্মচারীদের জেরা করে গেছে। আপনাকেও নিশ্চয় করেছে?

করেছে মিঃ লাল! পুলিস আবার আসবে। অবশ্য লাঞ্চের আগে কাকেও ডিসটার্ব করবে না। আর—কাকেও লজ ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছে পুলিস। জরুরি কারণ থাকলে অনুমতি নিতে হবে। সাদা পোশাকে দুজন অফিসার লাউঞ্জে বসে আছেন।

সিদ্ধেশ তো বলল না কিছু! অবশ্য লাউঞ্জে দুজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। আজকালকার তরুণরা সবকিছুতে নির্লিপ্ত থাকতে চায়।

চমনলাল একটু দ্বিধার পর বললেন, মেয়েটিকে কি কেউ ধাক্কা মেরে জলে—

নাহ্ মিঃ লাল! তার মাথার পিছনে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেখে গুলি করা হয়েছে। তারপর বডি নদীতে ফেলে দিয়েছে হত্যাকারী।

ও মাই গড! তা হলে—পুলিস হনিমুনারদের স্যুইট সার্চ করবে। তাই না?

করা তো উচিত।

চমনলাল নড়ে উঠলেন। খুব আস্তে বললেন, আমার স্যুইটে আসুন দয়া করে। আমি দায়িত্বশীল নাগরিক। আপনার সঙ্গে কিছু গোপনীয় আলোচনা আছে। আসুন!···

॥ ছয় ॥

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চমনলালের স্যুইট থেকে বেরিয়ে দেখলেন, সুভদ্রা ঠাকুর তাঁর স্যুইটের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছেন। মাঝখানের স্যুইটটায় শোভন এবং ঋতুপর্ণা উঠেছিল। সেটার দরজা পুলিস সিল করে রেখেছে। কর্নেলকে দেখে সুভদ্রা নিঃশব্দে হাঁসলেন। তেমনি পাগলাটে চাউনি।

কর্নেল বললেন, কিছু বলবেন কি মিসেস ঠাকুর?

সুভদ্রা ফিসফিস করে বললেন, ফাদার পিয়ার্সনের পার্কটা আর নেই। শুধু একটা বেদি আছে। দেখেছেন?

হ্যাঁ। দেখেছি।

আপনাকে বলছি কথাটা। পুলিসকে আমি বলিনি এবং বলবও না। ওখানে সকালে লক্ষ্য করেছিলাম একজন হনিমুনার অন্যজনের বউয়ের সঙ্গে বসে ছিল। আমি লুকিয়ে ওদের দেখছিলাম।

কর্নেল হাসলেন। আমিও দেখেছি মিসেস ঠাকুর!

এইমাত্র ওখানে গিয়ে দেখলাম পাথরের বেদিতে প্রচুর রক্ত! গিয়ে দেখে আসুন।

প্রচুর রক্ত? আমি অবশ্য একটু লাল রঙের ছিটে দেখেছিলাম।

সুভদ্রা রুষ্টমুখে বললেন, আপনি ভালো করে দেখেননি! এখন গিয়ে দেখুন।

মিসেস ঠাকুর! বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন? আমি আপনার সহযোগিতা আশা করছি কিন্তু।

কী বলতে চান আপনি?

বেদিতে যে লাল রঙের ছিটে দেখেছিলাম, তা রক্ত নয়। ব্রাসিলিকা ইন্দিকা নামে একরকম উদ্ভিদের লাল ফুল এই এলাকায় এখন প্রচুর ফোটে। ওটা তারই রঙ। এবং আপনিই চুপিচুপি ওই রঙটুকু ছড়িয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কেন? আপনি কি এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন—

তাঁকে বাধা দিয়ে সুভদ্রা বললেন, জিতেন্দ্রর মামা আমাকে বলেছিল কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে।

মিসেস ঠাকুর! বুঝতে পারছি, আপনি এখন আবার গিয়ে বেদিতে ওই ফুলের রঙ বেশি করে ছড়িয়ে এসেছেন। চমনলালজি একটু আগে দেখেছেন আপনি দু'হাত শাড়ির আঁচলে ঢেকে লজে ঢুকছিলেন। কারণ আপনার দু'হাত লাল হয়ে গিয়েছিল।

সুভদ্রা এখনই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কর্নেল রিসেপশনে গেলেন। সিদ্ধেশ কান থেকে ওয়াকম্যান খুলে বলল, আপনার আর কোনও টেলিফোন আসেনি স্যার!

কর্নেল বললেন, তোমরা লাঞ্চ কখন খাওয়াচ্ছ সিদ্ধেশ?

সে ঘড়ি দেখে বলল, বড় জোর দেড়টা বাজবে। আসলে ম্যানেজার সাব মার্কেটিংয়ে দেরি করে ফেলেছিলেন। আপনার লাঞ্চ আগেই পাঠিয়ে দেব।

সিদ্ধেশ! এ বেলা আমি ডাইনিংয়েই খাব। হনিমুনারদের সঙ্গে।

কর্নেল তাঁর স্যুইটে ফিরে আসছিলেন। ওপরের করিডরে সোমক দাঁড়িয়ে

ছিল। সে বলল, আপনাকে খুঁজছিলাম কর্নেল সরকার! আপনার স্যুইটে নক করে সাড়া পেলাম না।

বলুন মিঃ চ্যাটার্জি!

আমার স্ত্রী শ্রুতি এখন স্নান করছে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। পুলিস আবার আসার আগে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি ঘরেই থাকছি।

কর্নেল চাবি বের করে তাঁর স্যুইটের দরজা খুলছেন, তখন সোমক আস্তে বলল, আপনি নদীর ধারে পাথরটার ওপর যে লাল রঙের ছিটে দেখেছিলেন, শ্রুতির কথা শোনার পর তা এক্সপ্লেন করতে পারি।

জানি। তা একরকম লাল ফুলের রঙ।

কিন্তু পুলিস আমাকেই সন্দেহ করেছে তা বুঝতে পেরেছি। সোমক ক্ষুব্ধভাবে বলল। ওই উন্মাদ মহিলা মিসেস ঠাকুরের কথায় পুলিস আমাকে জেরার ছলে অপমান করছিল। আপনি চুপচাপ ছিলেন কর্নেল সরকার। আপনার আচরণের অর্থ বুঝতে পারছি না। আমার কেরিয়ার নষ্ট করে আপনার কী লাভ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, কেউ কারও কেরিয়ার নষ্ট করতে পারে না। মানুষ নিজের কেরিয়ার নিজেই নষ্ট করে। এনিওয়ে! আপনার স্ত্রী কথা বলতে চাইলে আমি অবশ্যই শুনব। হ্যাঁ—আই অ্যাম রিয়্যালি ইণ্টারেস্টেড। প্লিজ ডোণ্ট বি ওয়ারিড।

ঘরে ঢুকে দরজা লক্ করে দিলেন কর্নেল। প্রায় একটা বাজে। প্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে তিনি রুমালে মোড়া খুদে আগ্নেয়াস্ত্রটি বের করলেন। চমনলালের বর্ণনা অনুসারে এতে আর হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ আশা না করাই উচিত। আবর্জনার পাত্রে অনেক তরল পদার্থ পড়ে ছিল।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ঋতুপর্ণাকে হত্যা করা হয়েছে নদীর ওপারেই—সম্ভবত, লেক অর্থাৎ প্রপাত জলাশয়ের কাছাকাছি। রমেশ পাণ্ডের ড্রাইভার রাম সিং লেকের কোথায় মৃতদেহ দেখেছিল, পুলিস তার কাছে জেনে নেবে। কিন্তু সমস্যা হল পাণ্ডে প্রভাবশালী লোক। তার চারিত্রিক দুর্নাম আছে। এই অঞ্চলে নাকি সে যা খুশি তা-ই করতে পারে। সে নিজে যদি এ ঘটনায় জড়িত থাকে, হত্যাকারীকে চেনা গেলেও রেহাই পেয়ে যাবে।

কিন্তু শোভন রায় গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? এটাই এ ঘটনার সবচেয়ে অদ্ভুত দিক।

অনেক প্রশ্ন মাথার ভেতর ভনভন করছে ক্রমাগত। হত্যারহস্য খুবই জটিল হয়ে গেল এতক্ষণে—চমনলালজির কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্রটি পাওয়ার পর।

কর্নেল কিটব্যাগে অস্ত্রটা রুমালে জড়ানো অবস্থায় লুকিয়ে রাখলেন। চমনলাল দম্পতিকে তিনি নিষেধ করেছেন, পুলিসকে যেন ওঁরা এ সম্পর্কে কিছু না বলেন। এই জিনিসটা তাঁর ট্রাম্পকার্ড। পুলিস এটা জেনে গেলে কী করবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় তিনি দেখেছেন স্থানীয় পুলিস আনপ্রেডিক্টেবল। কাজেই ওপরতলার কোনও অফিসার না এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত তাঁকে 'ওয়েট অ্যাণ্ড সি'-নীতি অনুসরণ করতেই হবে।

কর্নেল কিটব্যাগটা বিছানার ওপাশে রেখে এলেন। ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরালেন। সোমক চ্যাটার্জি যে কেরিয়ারিস্ট, তা বুঝতে পেরেছেন। সে মডেলিং এবং অভিনয় করে। তার লক্ষ্য ফিল্মস্টার হওয়া। কিন্তু সে যে একটা কিছু গোপন করেছে, তাতে ভুল নেই এবং তা করেছে সম্ভবতঃ কেরিয়ারের স্বার্থেই। এবার স্ত্রীকে দিয়ে সে কি তাঁকে ভুল পথে ছোটাতে চায়? দেখা যাক্।

দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন সোমক এবং তার স্ত্রী শ্রুতি দাঁড়িয়ে আছে। শ্রুতি নমস্কার করল। কর্নেল বললেন, আসুন—মিসেস চ্যাটার্জি!

সোমক বলল, আমি ঘরে যাচ্ছি। শ্রুতি! ওঁকে সব কথা খুলে বলো।

কর্নেল দরজা বন্ধ করে বললেন, বসুন মিসেস চ্যাটার্জি!

শ্রুতি সদ্য স্নান করে এসেছে। আড়ষ্টভাবে বসল। বলল, আমাকে তুমি বললে খুশি হব কর্নেল সরকার! আমার নাম শ্রুতি।

হুঁ। বলো!

আমি আর দীপক ধারিয়া ফলসের ওপরদিকে শোভনবাবুকে দেখেছিলাম। মাত্র এক মিনিটের জন্য। আপনি দীপককে জিজ্ঞেস করতে পারেন। দুটো পাথরের ফাঁকে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ সরে গেলেন। এখন মনে হচ্ছে উনি নিজেই স্ত্রীকে মেরে ফলসে ফেলতে এসেছিলেন।

কর্নেল হাসলেন। আমিও বাইনোকুলারে ওঁকেই দেখেছিলাম। হ্যাঁ—ওঁর গতিবিধি অবশ্যই সন্দেহজনক। তো তোমার স্বামী কি তোমাকে বলেছে সে ঋতুপর্ণার সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করছিল?

বলেছে। সোমককে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

শ্রুতি আস্তে বলল, সোমকই ফলসে দল বেঁধে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল। অথচ মর্নিংয়ে বলল, শরীর খারাপ। যাবে না। ফিরে এসে ঘটনাটা শোনার পর ওকে চার্জ করলাম। তখন ও একটা অদ্ভুত কথা বলল।

কী বলল ?

পায়েল—মানে অনির্বাণদার স্ত্রী সোমকের মডেলিংয়ের জুটি ছিল একসময়। পায়েলকে এড়িয়ে থাকার জন্য সে নাকি যায়নি।

কেন এড়িয়ে থাকতে চেয়েছে ?

সোমক খুলে কিছু বলল না। শুধু বলল, শি ইজ ডেঞ্জারাস। শ্রুতি একটু ইতস্তত করার পর ফের বলল, ওদের দু'জনের মধ্যে এমোশনাল সম্পর্ক ছিল একসময়। আমি জানি। তারপর সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যায়। আমার ধারণা, পায়েল অনির্বাণদার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। সোমকের এতে রাগ হতেই পারে।

কিন্তু তুমি সোমকের স্ত্রী! কর্নেল হাসলেন। সব জেনেও তুমি—

কর্নেল সরকার! আমার মন অত নিচু নয়। অ্যাণ্ড আই অ্যাম নট এ জেলাস ওয়াইফ।

যাই হোক্! বেড়ানো কেমন এঞ্জয় করলে বলো ?

আই এন্‌জয়েড। কিন্তু ফিরে এসে একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ শুনে সব আনন্দ চলে গেছে।

ডাইনোসরের ছবি দেখেছ ?

টর্চের আলোয় কিছু বোঝা যায় না। সে বি. এ হোক্স! শ্রুতি উঠে দাঁড়াল। আমি যাই। আপনি দীপককে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। শোভনবাবুকে প্রথমে সেই দেখতে পেয়েছিল।

একটা কথা। দীপক তোমার পূর্বপরিচিত ?

শ্রুতির চোখে একটু চমক লক্ষ্য করলেন কর্নেল। সে বলল, ওকে চেনা মনে হচ্ছিল, তা সত্যি। কোথায় যেন দেখেছি। তবে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। দীপক আর তার স্ত্রী কুমকুমের সঙ্গে এখানে এসেই আলাপ হয়েছে। দীপককে কি পাঠিয়ে দেব ?

কর্নেল বললেন, থাক্। দেড়টায় লাঞ্চ্‌ খেতে যাব। তৈরি হয়ে নিই।

শ্রুতি চলে গেল। কর্নেল দরজা ভেতর থেকে লক করে বাথরুমে গেলেন।

স্নান করার পর পোশাক বদলে কিটব্যাগ থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে ঢোকালেন। তারপর নীচে ডাইনিং হলে গেলেন।

সুভদ্রা ঠাকুর এক কোণে বসে খাচ্ছেন এবং আপন মনে বিড়বিড় করে কী সব বলছেন। চমনলাল এবং বিজয়া দেবী অন্য কোণে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। কিচেনবয় তাঁদের খাদ্য পরিবেশন করছে। কর্নেল রিসেপশন কাউন্টারের দিকে তাকালেন। সিদ্ধেশ ডাকল, কর্নেল সাব!

কর্নেল কাছে গিয়ে বললেন, বলো সিদ্ধেশ?

সিদ্ধেশ চাপা স্বরে বলল, একটা টেলিফোন এসেছিল। কেউ বলছিল, আমি শোভন রায় বলছি। আমার স্ত্রী ঋতুপর্ণাকে ডেকে দিন। তো আমি বললাম, আপনার স্ত্রী মিসহ্যাপ হয়েছে। আপনি এখনই চলে আসুন এখানে। পুলিস আপনাকে খুঁজছে। অমনই লাইন কেটে গেল। মিঃ রায় এবার এসে পড়বেন মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক জানেন না কী হয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। জানেন। জেনেও কৌতুক করছেন। বুঝলে সিদ্ধেশ?

সিদ্ধেশ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল বললেন, আবার শোভন রায় বলে কেউ টেলিফোন করলে তুমি তাকে বলবে, আপনি কর্নেল সরকারেব সঙ্গে কথা বলুন।

আচ্ছা সার!

কর্নেল চমনলাল দম্পতির কাছাকাছি একটা টেবিলে বসলেন। জগদীশ সেলাম ঠুকে তাঁর খাবার নিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনির্বাণ ও পায়েল, সোমক ও শ্রুতি, দীপক ও কুমকুম এসে গেল। সোমক ও শ্রুতি বসল আলাদা টেবিলে। অনির্বাণ, পায়েল, দীপক আর কুমকুম একই টেবিলে মুখোমুখি বসল। সবাই গম্ভীর। কর্নেল লক্ষ্য করেছিলেন, সোমক ও শ্রুতি ছাড়া ওরা চারজনে আড়চোখে তাঁকে একবার করে দেখে নিচ্ছে।

কর্নেল একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে লাউঞ্জে গেলেন। পুলিসের দুই গোয়েন্দা অফিসার এবার ডাইনিংয়ে ঢুকলেন। তাঁদের হনিমুন লজ খাওয়াবে। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর তিনি রিসেপশন কাউন্টারে গেলেন। বললেন, সিদ্ধেশ! তোমার তো মোটরবাইক আছে!

সিদ্ধেশ বলল, মোপেড আছে সার!

তোমার গাড়িটা একবার দেবে?

কেন দেব না ?

শিগগির এনে দাও। আমি একবার বেরুব। থানা থেকে ইন্সপেক্টর মিঃ দুবে এলে তাঁকে বলবে, জরুরি কাজে আমি একটু বেরিয়েছি। ওঁদের যা কর্তব্য, ওঁরা করবেন।

সিদ্ধেশ একটু অবাক হয়ে বলল, আপনি মোপেড চালাতে পারেন বিশ্বাস করা যায় না।

কর্নেল হাসলেন। ভুলে যেও না সিদ্ধেশ। আমি নামরিক বাহিনীতে ছিলাম। সবরকমের যানবাহন চালানোর অভ্যাস আমার আছে। হ্যাঁ—প্রথমে কিছুক্ষণ অসুবিধে হবে। তারপর বাহনটিকে শায়েস্তা করে ফেলব।

সিদ্ধেশ গ্যারাজের দিক থেকে তার দু'চাকার গাড়িটা এনে দিল। তারপর চাবি দিল।

কর্নেল লন পেরিয়ে গেটে গেলেন। গেট খুলে বেরিয়ে মোপেড চেপে স্টার্ট দিলেন। উৎরাইয়ের রাস্তায় স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল দু'চাকার গাড়িটি। নতুন কেনা হয়েছে। তাই এমন সাবলীল গতিবেগ। হাইওয়েতে পৌঁছেই ডাইনে ব্রিজের দিকে এগিয়ে চললেন কর্নেল।

পায়ে হেঁটে প্রপাত-জলাশয়ের কাছে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যেত। হাইওয়ে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। ডানদিকে সংকীর্ণ পিচ রাস্তা এগিয়েছে ধারিয়া প্রপাতের দিকে। পিচ রাস্তায় গতি কমালেন কর্নেল। ডাইনে ধারা নদী গাছপালা আর পাথরের ফাঁকে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছিল। এতক্ষণে প্রপাত দেখে ফিরে আসছিল মানুষজন চারচাকা বা দু'চাকার গাড়িতে। বিকেলের মধ্যেই নির্জন হয়ে যায় ধারিয়া প্রপাত। ইদানীং এখানেও আদিবাসীদের মধ্যে জঙ্গি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। তাদের হামলার ভয় আছে।

লেকের একটু আগে থেকে মোপেডের গতি খুবই মন্থর করেছিলেন কর্নেল। এক জায়গায় থেমে গেলেন। পিচরাস্তার ডানদিক ঘেঁষে কোনও গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্ট ফুটে আছে। কারণ ঘাসের কুটোভর্তি কাদা লেগেছিল কোনও গাড়ির চাকায়।

মোপেড একপাশে রেখে কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর চাকার দাগের দিকে তাকালেন। গাড়িটা এখানে ডাইনে ঘাসের ওপর একদিকের চাকা নামিয়েছিল। অন্য গাড়িকে সাইড দেবার জন্য ?

তা হতেই পারে। ট্রাক বোঝাই মানুষজন প্রপাতের ওখানে পিকনিক করতে

যায়। একটা ট্রাক এবং একটা প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সি পাশাপাশি চলার মতো চওড়া রাস্তা এটা নয়। তবে ডানদিকে নেমে যে গাড়ি অন্য গাড়িকে সাইড দিয়েছে, সেটা প্রপাতের দিক থেকে আসছিল বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু একটু পরে কর্নেল লক্ষ্য করলেন, গাড়িটার চাকার দাগ ডাইনে নদীর দিকে একটুকরো ঘাসে ঢাকা জমির ওপর থেকে উঠে এসেছে। ঘাসের ওপর চাকার দাগ মুছে যায়নি। ঘাসগুলো থেঁতলে গেছে এবং কাদা ছড়িয়ে আছে।

ঘাসজমিটার তুধারে জঙ্গল এবং উঁচু পাথরের চাঁই। শেষ দিকটায় গিয়ে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। জঙ্গলের আড়াল থাকায় বোঝা যায়নি এটা লেকের একটা প্রান্ত। জলপ্রপাতের গর্জনও কানে এল এবার। আসলে প্রপাতের কাছে রাস্তাটা একটু ঘুরে গিয়ে পৌঁছেছে। এখান থেকে প্রপাত কাছেই।

তার মানে গাড়িটা এই ঘাসের জমিতে নেমেছিল। কর্নেল দেখলেন, নদীর দিকে জঙ্গলের মধ্যে সেই লাল ফুল প্রচুর ফুটে আছে এবং একটা ঝোপের ডাল ভেঙে কেউ ফুল তুলেছিল। নীচে অনেকটা জায়গা লাল হয়ে আছে! তারপরই চমকে উঠলেন কর্নেল। ঝোপের তলায় পাথরের ফাঁকে একপাটি স্লিপার পড়ে আছে। মেয়েদের জুতো!

এবং তার নীচেই লেকের জল ফুঁসছে। ঘুরপাক খাচ্ছে।

তাহলে কি এখানেই ঋতুপর্ণাকে কেউ ডেকে এনে গুলি করে মেরেছে?

জুতোটা একটা চ্যাপ্টা বড় পাথর তুলে ঢেকে দিলেন কর্নেল। তারপর ঘাস-জমিটা আবার খুঁটিয়ে দেখার পর রাস্তায় গেলেন। বাইনোকুলারে প্রপাতের দিকটা দেখতে থাকলেন। নীলসারস দম্পতির কথা মনে পড়ে গেল। সেই গাছটা খুঁজতে থাকলেন।

সারসদম্পতি নেই। ওরা একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকে না।

কর্নেলের মাথায় এখন সারসদম্পতি ভর করেছে। তা ছাড়া একা কোথাও বসে ধীরে-সুস্থে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। কর্নেল মোপেডে চেপে ধারিয়া ফলসের দিকে চললেন।

রাস্তাটা একটা টিলা ডাইনে রেখে একটু ঘুরে প্রপাতের এপারে পৌঁছেছে। এখনই ঘন ছায়া ঢেকে ফেলেছে জায়গাটা। পুরনো সরকারি বাংলো জনহীন সুনসান। আদিবাসীদের আন্দোলনের পর বাংলোটা পোড়ো হয়ে গেছে। মোপেড বাংলোর নীচে সমতল এক টুকুরো জমিতে দাঁড় করিয়ে কর্নেল নেমে গেলেন। পাথরের সিঁড়ির নীচে চওড়া পার্কমতো জায়গা। ওখান থেকেই

লোকেরা প্রপাত দর্শন করে। সেই আবর্জনার পাত্রটার কাছে গেলেন কর্নেল। ওটা একটা লোহার ড্রাম। লেখা আছে, 'ইউজ মি।' ড্রামটা আবর্জনায় ভর্তি। চমনলালজি এর মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটা পেয়েছিলেন।

একটা প্রশ্ন মনে এল। উনি কেন দলের লোকেদের ফেলে দেওয়া এঁটো পেপারকাপ ড্রামে ফেলতে গেলেন? কাকেও কি অস্ত্রটা ফেলতে দেখেছিলেন? চমনলালজি বলেছেন, পেপারকাপগুলো ওভাবে পড়ে থাকায় তাঁর মনে হয়েছিল, দলের যুবকযুবতীদের একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ওরা কেউ তাঁর এই কাজের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

কর্নেলের মনে খটকা থেকে গিয়েছিল। এখানে এসে সেটা বেড়ে গেল। চমনলালজি নিশ্চয় কিছু লক্ষ্য করেছিলেন। হয়তো সন্দেহ হয়েছিল কেউ গোপনে কিছু ফেলল। তাই পেপারকাপ ফেলার ছলে আবর্জনার পাত্র খুঁজে-ছিলেন। ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আবার কথা বলা দরকার।

হঠাৎ কর্নেল দেখলেন প্রপাতের শীর্ষে দুটো পাথরের মাঝখানে কেউ উঁকি দিচ্ছিল। এইমাত্র সরে গেল।

দ্রুত বাইনোকুলারে তাঁকে খুঁজলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন না আর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কর্নেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মোপেডের কাছে গেলেন। তারপর স্টার্ট দিয়ে ফিরে চললেন হনিমুন লজে।

তাঁরে মন এখন একটাই সাফল্যের আনন্দ। হত্যার স্থান আবিষ্কার।··

।। সাত ।।

হনিমুন লজের গেটের কাছে ম্যানেজার রঘুবীর রায় দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেলকে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, পুলিস আমাকেই থ্রেটন করে গেল। এবার থেকে আমি যেন কোনও বিশিষ্ট লোকের রেফারেন্স ছাড়া হনিমুনারদের থাকতে না দিই! এ কী অদ্ভুত নির্দেশ দেখুন কর্নেল সাব!

কর্নেল মোপেড ঠেলে লনে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, ইন্সপেক্টর মিঃ দুবে কি জেরা শেষ করে চলে গেছেন রঘুবীর?

এইমাত্র গেলেন। আপনি থাকলে ভালো হত। কোথায় বেরিয়েছিলেন?

নীলসারস দম্পতির খোঁজে। তুমি জানো, বিকেলের পর ওদিকের রাস্তায় জঙ্গিদের উপদ্রব হয়। তাই সিদ্ধেশের এই গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।

রঘুবীর চাপা গলায় বললেন, মিঃ দুবে বলে গেলেন, এবার থেকে লজে কোনও দম্পতি এলেই যেন তাঁদের নামধাম এবং রেফারেন্স জানিয়ে দিই!

মিঃ দুবে কি তোমার বোর্ডারদের সম্পর্কে কোনও নির্দেশ দিয়ে গেলেন?

নাহ্! মিঃ রুদ্রের সঙ্গে রমেশ পাণ্ডের বন্ধুত্বা আছে। সিদ্ধেশ বলল, রুদ্রসাব পাণ্ডেজিকে ফোন করেছিলেন। পাণ্ডেজি পুলিসকে সম্ভবত কিছু বলেছেন। তাই বোর্ডারদের একে একে আমার অফিসঘরে ডেকে শুধু জেরা করে চলে গেল। মিঃ দুবের হাবভাবে বুঝলাম, পুলিস শোভন রায়কেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করেছে। তাঁকেই খোঁজা শুরু হবে এবার—আমার ধারণা। আর একটা কথা আপনাকে বলা উচিত।

বলো রঘুবীর।

শোভন রায়ের স্যুইটের জিনিসপত্র আবার সার্চ করা হল। আমি উপস্থিত ছিলাম তখন। মিঃ দুবে ঋতুপর্ণার স্যুটকেশ থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য কর্নেল সাব। ওঁদের স্যুইটে শোভন রায়ের কোনও জিনিসই নেই। না কোনও স্যুটকেশ, না পোশাক। কিছু না।

হুঁ! ব্যাপারটা অদ্ভুত! তবে আমি এর ব্যাখ্যা করতে পারি। শোভনবাবু খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঋতুপর্ণার সঙ্গে ওঁর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল।

আপনি শুনেছিলেন?

না। চমনলালজির স্ত্রী বিজয়া দেবী আমাকে বলেছেন। তা ছাড়া সোমক চ্যাটার্জিও বলেছে। বলে কর্নেল বারান্দার কাছে গিয়ে ডাকলেন, সিদ্ধেশ! তোমার গাড়িটা ফেরত নাও।

সিদ্ধেশ বেরিয়ে এসে তার মোপেডটা গ্যারাজের দিকে নিয়ে গেল।

কর্নেল লক্ষ্য করলেন, দক্ষিণের বাগানে সোমক ও শ্রুতি একটা বেঞ্চে বসে কথা বলছে। কর্নেল বললেন, রঘুবীর! আমি কফি খাব।

রঘুবীর ভেতরে ঢুকলেন। কর্নেল বারান্দায় বসে ঘড়ি দেখলেন। চারটে বেজে গেছে। ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরেছেন। নদীর ব্রিজের ওধারে মোপেড দাঁড় করিয়ে রেখে চুপচাপ বসে ছিলেন।

সিদ্ধেশ গ্যারাজ থেকে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন, তোমাদের হনিমুনাররা কে কোথায় সিদ্ধেশ?

সিদ্ধেশ হাসল। যে যার ঘরে রেস্ট নিচ্ছেন। শুধু চ্যাটার্জিসাবরা বাগানে বসে আছেন।

দেখলাম। তো মিসেস ঠাকুর?

ওঁর যা বাতিক! ধারিয়া ফলসে স্বামীর আত্মার সঙ্গে গল্প করতে গেলেন। আমাকে ডাকছিলেন সার! আমি তো ওঁর মতো পাগল নই। তবে সার, মিঃ ডুবে ওঁকে যা ধাঁতানি দিয়েছেন, ওঁর পাগলামি অনেকটা সেরে যাবে দেখবেন। বলে সিদ্ধেশ হাসতে হাসতে চলে গেল ভেতরে।

জগদীশ কফি রেখে গেল। কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে রঘুবীর এসে বললেন, কর্নেলসাব! আপনার টেলিফোন। মিঃ ডুবে কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

রিসেপশনে গিয়ে কর্নেল সাড়া দিলেন। তারপরই বললেন, আমি দুঃখিত মিঃ ডুবে। নীলসারস দম্পতির হনিমুনের দিকেই আমার বেশি আকর্ষণ। তাই—

কর্নেল সরকার! ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার ডুবের হাসির শব্দ ভেসে এল। আপনার হবির কথা আমি জানি। যাই হোক, আপনাকে জানানো উচিত মনে করছি। ঋতুপর্ণার আসল নাম পিয়ালি রায়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। ওর স্যুটকেসে কয়েকটা চিঠি পেয়েছি। বিপজ্জনক মেয়ে ছিল পিয়ালি।

বলেন কি মিঃ ডুবে?

সে একজন সঙ্গী জুটিয়ে এনেছিল। হনিমুন লজে এমন একজন এসেছে, যাকে ব্ল্যাকমেল করত সে। এখানেও সে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল। আমার ধারণা, বখরা নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর সঙ্গী লোকটা তাকে খুন করেছে।

কে সেই হনিমুনার তা কি জানতে পেরেছেন?

নাহ্, কর্নেল সরকার! তবে আমি সোমক চ্যাটার্জিকেই সন্দেহ করছি।

হুঁ। কিন্তু ব্ল্যাকমেলের ভিত্তিটা কী, তা টের পেয়েছেন কি?

পিয়ালি তার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানত। কোনও ডকুমেন্ট তার কাছে নিশ্চয় ছিল।

কিন্তু সেটা তো খুঁজে পাননি! নাকি পেয়েছেন?

স্বীকার করছি, পাইনি। তবে হনিমুন লজেই কোথাও লুকোনো থাকতে পারে। অথবা পিয়ালির সঙ্গী তথাকথিত শোভন রায় সেটা হাতিয়ে নিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। আমরা লোকটাকে খুঁজে বের করবই। সে এখনও এলাকা ছেড়ে যেতে পারেনি। কর্নেল সরকার! আমার দ্বিতীয় ধারণাটার

ওপর জোর দিচ্ছি। পিয়ালির সঙ্গীর কাছেই ব্ল্যাকমেলিং-এর ডকুমেন্ট থাকা সম্ভব। এবার অনুরোধ কর্নেল সরকার! আপনি একটু নজর রাখুন।

আচ্ছা মিঃ দুবে, ড্রাইভার রাম সিংয়ের কোনও স্টেটমেন্ট কি নিয়েছেন? সে-ই কিন্তু প্রথমে ডেডবডিটা দেখতে পেয়েছিল।

দুবের হাসি ভেসে এল। আমাকে অত বোকা ভাববেন না কর্নেল সরকার! রাম সিংয়ের স্টেটমেন্ট নিয়েই তো ফের হনিমুন লজে গিয়েছিলাম। বেচারার সম্ভবত আন্ত্রিক হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন পাণ্ডেজি!

আন্ত্রিক?

এটা কি গুরুত্বপূর্ণ কর্নেল সরকার? আপনি এমন সুরে প্রশ্নটা করলেন যেন—

নাহ্। ছেড়ে দিন।

ঠিক আছে কর্নেল সরকার! রাখছি। পরে দরকার হলে যোগাযোগ করব।···

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। রোদের রঙ এখন লালচে হয়ে গেছে। দূরের পাহাড় ঘন নীল এবং গাছপালায় কুয়াশা ঘনাচ্ছে। বাতাসে হিমের আমেজ। কর্নেল জ্যাকেটের চেন টেনে দিলেন। টেবিলে রাখা টুপিটা তুলে মাথায় আঁটো করে বসিয়ে দিলেন।

এই সময় চমনলাল দম্পতি বেরিয়ে আসছিলেন। কর্নেল বললেন, নমস্তে!

নমস্তে কর্নেলসাব!

বেড়াতে বেরুচ্ছেন নাকি?

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ম্লান হাসলেন। নাহ্! একটু হাঁটাচলার অভ্যাস আছে দু'বেলা। কিন্তু বাইরে যাচ্ছি না। লনে বা বাগানে ঘুরব।

বিজয়া দেবীকে বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। দুজনে লনে নেমে গেলেন। গেট পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা বাগানে ঢুকলেন। একটু পরে দীপক ও কুমকুম বেরিয়ে এল। তারা কর্নেলের দিকে একবার তাকিয়েই লনে নামল। তারপর গেট পেরিয়ে গেল।

কর্নেল দেখলেন শ্রুতি বাগান থেকে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গ নিল। মিনিট দশেক পরে পায়েল একা বেরিয়ে এসে কর্নেলকে বারান্দায় দেখে মার্কিন রীতিতে বলল, হাই!

হাই মিসেস রুদ্র!

পায়েল একটু হাসল। কর্নেল সায়েব! অনির্বাণ আমার স্বামী হলেও আমি নিজের পদবি বদলাইনি। আমি পায়েল ব্যানার্জি!

ইজ ইট ফর সেব অব ইওর প্রোফেশন?

ইয়া।

আপনার হাজব্যাণ্ড্ বিশ্রাম নিচ্ছেন সম্ভবত?

হি ইজ ড্যাম টায়ার্ড। বলে পায়েল বারান্দায় গেল। বসতে পারি কর্নেল সায়েব?

কর্নেল হাসলেন। কেন নয়? এই বেতের চেয়ারগুলো সবার বসার জন্য।

পায়েল কর্নেলের কাছাকাছি চেয়ারে বসে আস্তে বলল, অনির্বাণের সন্দেহ হয়েছে আপনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

সরি মিসেস—

মিস ব্যানার্জি বলুন!

কিন্তু আপনি মিঃ রুদ্রের স্ত্রী!

আপনার হাবভাবে মনে হয়েছে আপনি একজন মডার্ণ ম্যান। কাজেই আপনাকে সত্যি কথাটা বলা উচিত। উই লিভ টুগেদার। উই আর নট এ ম্যারেড কাপ্‌ল্ ইউ নো!

আই সি!

কর্নেল সায়েব! আমি সবসময় স্পষ্ট কথা বলি। আমারও সন্দেহ হয়েছে, কেউ আপনাকে আমাদের পেছনে লাগিয়েছে।

লাগানোর কি বিশেষ কোনও কারণ আছে মিস ব্যানার্জি?

আছে। অনির্বাণ একটা ফিল্ম করতে চায়। বিগ বাজেটের ফিচারফিল্ম। আসলে সে আমাকে নিয়ে তাই লোকেশন দেখতে এসেছে। ধারানগরে তার কোম্পানির ব্রাঞ্চ আছে। বন্ধুবান্ধবও আছে।

রমেশ পাণ্ডে?

আপনি তাও জানেন দেখছি!

জেনেছি। কারণ পাণ্ডে তাঁর জিপ আপনাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন! কর্নেল হাসলেন। বাই এনি চান্স, ফিল্মটা কি ডাইনোসর নিয়ে? স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক' ছবিটা নাকি এ দেশে হিড়িক ফেলে দিয়েছে। এবং আপনারা ধারিয়া ফলস এরিয়ায় গুহাচিত্র দেখতে গিয়েছিলেন। কোন গুহায় নাকি ডাইনোসরের ছবি আছে।

পায়েল তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাঁকে দেখছিল। আস্তে শ্বাস ফেলে বলল, দ্যাটস রাইট। তা অনির্বাণ যা বলছিল, তা মিলে যাচ্ছে। সে যে একটা ফিল্ম করতে চায়, তা তার প্রতিদ্বন্দ্বী জানে। কিন্তু ফিল্মটা কী নিয়ে হবে, তা জানত না।

এখন দেখছি আপনি তা জেনে গেছেন। এবং আপনার ক্লায়েন্টকে জানিয়ে দেবেন। এই তো ?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি ভুল করছেন মিস ব্যানার্জি! প্রথমত আমি ডিটেকটিভ নই এবং কথাটা ভীষণ অপছন্দ করি। দ্বিতীয়ত এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য কেউ ডিটেকটিভ পেছনে লাগাবে বলে মনে হয় না। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। আমি নেচারিস্ট্। বিদেশি সায়েন্স ম্যাগাজিনে নানা বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ লিখি। এটাই আমার হবি।

বাট ইউ আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দা মার্ডার অব পিয়ালি।

কর্নেল তাকালেন। পিয়ালি ? কে সে ?

যে ঋতুপর্ণা নামে এখানে এসেছিল।

আপনি তাকে চিনতেন ?

হুঁ। অনির্বাণও চিনত।

কিন্তু পিয়ালির মার্ডারের সঙ্গে আপনাদের ফিল্মের সম্পর্ক কী ?

পায়েল বাঁকা হাসল। আপনি তা জানেন। কারণ আপনার ক্লায়েন্ট তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

ডু ইউ মিন শোভন রায় ?

ইয়া। পায়েল বিকৃতমুখে ফের বলল, হি ইজ এ ন্যাস্টি ম্যান। তার আসল নাম বিকাশ সেন। সে একজন ফিল্ম প্রোডিউসার। অ্যাণ্ড ইউ নো দ্যাট ওয়েল।

কর্নেল হাসলেন। কিন্তু পুলিস তাকে খুঁজছে। সে-ই নাকি পিয়ালিকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

ইয়া।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিস ব্যানার্জি!

পায়েল রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বলল, কর্নেল সায়েব! বিকাশ আপনাকে কথাটা না বলতেও পারে। সে আপনাকে হায়ার করে অনির্বাণের ফিল্মের সাবজেক্ট সম্পর্কে সিওর হতে চেয়েছিল। তার পিয়ালিকে দিয়ে অনির্বাণকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল, যাতে অনির্বাণ তার প্রজেক্ট থেকে সরে দাঁড়ায়।

এ তো দেখছি একটা জটিল—আর ফানি ব্যাপার! কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, এনিওয়ে! ব্ল্যাক-মেইলের প্রশ্ন উঠলে বলব এর একটা ভিত্তি থাকা অনিবার্য। হোয়াটস্ দ্যাট মিস্ ব্যানার্জি ?

অনির্বাণ তার কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। তার একটা বোকামি হয়ে গেছে। সে ডাইনোসর নিয়ে ফিল্ম করার জন্য একটা প্রজেক্টের মোটা টাকা বেনামে সরিয়ে রেখেছে। এটা তত কিছু বেআইনি অবশ্য নয়। কিন্তু শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রটে গেলে একটু গণ্ডগোল হতে পারে। সো হোয়াট? অনির্বাণ তখন না হয় ফিল্ম করবে না। আবার দেখুন ফিল্মটা হিট করলে কোম্পানিই শেষ পর্যন্ত প্রফিট করবে এবং শেয়ার হোল্ডাররা ভাল ডিভিডেণ্ড পাবে। তাই না? পায়েল দম নিয়ে ফের বলল, মোট কথা বিকাশ নিজে সম্ভবত ডাইনোসর নিয়ে ছবি করতে চায়। এক ঢিলে দুই পাখি বধ। অনির্বাণ সরে দাঁড়াবে এবং তার আগে বিকাশের সঙ্গিনী পিয়ালি বোকা অনির্বাণকে ব্ল্যাকমেইল করে মোটা টাকা হাতিয়ে নেবে। যে বি—বিকাশ পিয়ালিকে হিরোইনের রোল দিতে লোভ দেখিয়েছিল।

কিন্তু পিয়ালির কাছে এমন কী ডকুমেণ্টস ছিল যে—

কর্নেল সায়েব! পিয়ালি ব্যাঙ্কে চাকরি করত। অনির্বাণের কোম্পানির অ্যাকাউণ্ট ডিল করত সে। নাও ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্য ব্যাকগ্রাউণ্ড? আপনার নিশ্চয় জানা। তবু না জানার ভান করছেন। পিয়ালি ব্যাঙ্কের আসানসোল-বার্ণপুর ব্রাঞ্চের এজেণ্ট। শি ওয়াজ অ্যান অ্যামবিশাস অ্যাণ্ড ফেরোশাস শর্মন!

বুঝলাম। বাট হোয়াই বিকাশ সেন কিল্‌ড পিয়ালি?

বখরা নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে থাকবে। কিংবা এমনও হতে পারে, পিয়ালির কাছে ব্যাঙ্ক ডকুমেণ্টের যে কপি ছিল, তা বিকাশ হাতিয়ে নিয়ে চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে।

মিস ব্যানার্জি! আপনি কাল অনেক রাতে লনে বসে ছিলেন। কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন?

পিয়ালি তাকাল। আপনি ওত পেতে ছিলেন দেখছি!

ধরুন, তা-ই।

আমি বিকাশের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কথামতো আসেনি। এনিওয়ে! আপনার ক্লায়েন্ট একজন মার্ডারার। আশা করি, তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টাই আপনার এখন প্রধান কাজ হবে।

কর্নেল হাসলেন। পসিবিলি! হোয়াই নট?

পায়েল উঠে দাঁড়াল। দেন আই ওয়ার্ন ইউ কর্নেল সায়েব, দ্যাট উইল বি

এ ডেঞ্জারাস গেম। ইউ নো রমেশ পাণ্ডে ওয়েল!

বলে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর লাউঞ্জে ঢুকে গেল। কর্নেল দেখলেন, লাউঞ্জে ঢোকার সময় পায়েল ব্যানার্জি একবার ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে গেল। বুঝলেন, অনির্বাণ রুদ্র তাঁকে হুমকি দিতে পাঠিয়েছিল। মেয়েটির দেহে উজ্জ্বল রূপলাবণ্য আছে। সোমকের মডেলিংয়ের জুটি ছিল নাকি। অনির্বাণের মতো বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে 'লিভ টুগেদার'-এর উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। ফিল্মের হিরোইন হতে চায়। সোমক অবশ্য সে আভাস দিয়েছে। তবে এ যুগে কে-ই বা কেরিয়ারিস্ট এবং অ্যামবিশাস নয়?

কর্নেল লনে নামলেন। সময়মতো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ দুবেকে জানাতে হবে পিয়ালি সত্যি আসানসোল-বার্ণপুরে কোনও ব্যাঙ্কের এজেন্ট ছিল কি না। একটা র‍্যাকেটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন। বিকাশ-পিয়ালি-অনির্বাণ। পায়েল ব্যানার্জি সম্পর্কে সোমক যেটুকু জানিয়েছে, তা সত্য হলে এই র‍্যাকেটে পায়েলের ভূমিকা গৌণ।

কর্নেল গেট পেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, ঢালের নীচে নদীর ধারে দীপক ও কুমকুম দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হনিমুনে আসা দম্পতির প্রেমালাপ বলে মনে হয় না। কারণ দুজনেই গম্ভীর।

কর্নেল প্রথমে গেলেন নদীর ধারে সেই গাছটার কাছে, যেখানে পাথরের মসৃণ বেদি আছে। বেদিটা সত্যিই সুভদ্রা ঠাকুর যথেচ্ছ রাঙিয়ে রেখেছেন। তবে এখন লাল রঙগুলো তত উজ্জ্বল নয়। সুভদ্রা কিছু লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে ভুল নেই। সোমক চলে যাওয়ার পরই সেখানে লাল ফুলের একটু রঙ ছড়িয়ে রেখেছিলেন। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পাগলামির মধ্যে কিছুটা অভিনয় আছে যেন। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি কি নদীর এধারে শর্টকাট রাস্তায় ধারিয়া ফলসে যাওয়ার সময় পিয়ালিকে হত্যার দৃশ্য দৈবাৎ দেখে ফেলেছিলেন?

গাছটার কাছ থেকে সরে অন্যত্র যাওয়ার ভঙ্গিতে কর্নেল দীপক ও কুমকুমের সামনাসামনি গেলেন। একটু হেসে বললেন, এক্সকিউজ মি! আপনাদের ডিসটার্ব করলাম না তো?

দীপক বলল, করলেন বৈকি! আমি আমার স্ত্রীকে এখানে মেরে ফেলতে এনেছিলাম। আপনি এসে পড়ায় তা হল না!

কুমকুম চটে গেল। কী অসভ্যতা করছ ভদ্রলোকের সঙ্গে!

দীপক নির্বিকার মুখে বলল, পায়েলদি বলছিলেন উনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

কর্নেল তাঁর অট্টহাসিটি হাসলেন। তারপর বললেন, ওটা আমাকে গাল দেওয়া হল দীপকবাবু! তবে হ্যাঁ—আমি কোথাও রহস্যময় ঘটনা ঘটতে দেখলে একটু নাক গলাই।

এখানে আর কোনও রহস্যময় ঘটনা ঘটবার চান্স নেই কর্নেল সায়েব!

কুমকুম বলে উঠল, দীপক ওঁকে সেই কথাটা বলো। তুমি আর শ্রুতিদি ফলসের ওপরে—

কর্নেল দ্রুত বললেন, শুনেছি। শোভনবাবুকে দেখতে পেয়েছিলেন!

দীপক বলল, অনির্বাণ-দাও দেখেছিলেন। ওঁর সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তাড়া ছিল বলে তত লক্ষ্য করেননি।

কুমকুম বলল, অনির্বাণদা কিন্তু ফলসের ওপরে ওকে দেখেননি দীপক! জানেন কর্নেল সায়েব? অনির্বাণদা যখন আমাদের ব্রেকফাস্টের জন্য জিপ নিয়ে খাবার আনতে যাচ্ছিলেন, তখন লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন, খাবার আনতে যাচ্ছিলেন অনির্বাণবাবু? একটু ডিটেল্‌স্ বলুন তো!....

।। আট ।।

আজ সন্ধ্যা থেকেই হিমেল হাওয়ার উপদ্রব ছিল। সন্ধ্যায় আর বাইরে বেরোয়নি হনিমুনাররা। রাত নটায় লাউঞ্জে কাল রাতের মতো ককটেল পার্টির আয়োজন করেছিল অনির্বাণ রুদ্র। সেই সঙ্গে তার খরচে ডিনার। ক্যাসেট প্লেয়ারে পপ মিউজিক বাজছিল। অনির্বাণ আগেই ঘোষণা করেছিল, বিকাশ সেনকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ দুবে টেলিফোনে তাকে এই সুখবর দিয়েছেন। তবে দুঃখের বিষয়, তার বন্ধু রমেশ পাণ্ডের আসার কথা ছিল। আসতে পারছেন না। কারণ তাঁর এক বিশ্বস্ত ড্রাইভার রাম সিং আস্ত্রিকে মারা গেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে তার জন্য, এক মিনিটের নীরবতা পালন ছাড়া? বিকাশ যেন এক জঘন্য খুনী। সে ধরা পড়েছে, এটাই এসব ছোট দুঃখকে চাপা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন!' পাণ্ডেজি হনিমুনারদের জন্য প্রচুর ড্রিঙ্ক উপহার পাঠিয়েছেন। সো লেট আস সেলিব্রেট দ্যা অকেসন!'

রাত সাড়ে নটায় ম্যানেজার রঘুবীর রায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেলেন। কর্নেলসাবের পাত্তা নেই। তাঁর কোনও বিপদ হয়নি তো? রমেশ পাণ্ডে সাংঘাতিক লোক।

গেটের দিকে নীচে থেকে আলোর ছটা এসে পড়ল। একটু পরে একটা অটোরিক্স এসে দাঁড়াল। রঘুবীর আশ্বস্ত হয়ে দেখলেন কর্নেলসাব নামছেন। অটোরিক্স চলে গেল। তখন রঘুবীর লনে এগিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, কী রঘুবীর? এনিথিং রং এগেন?

না স্যার! আমি আপনার জন্য চিন্তা করছিলাম।

কর্নেল হাসলেন। হ্যাঁ। তোমার চিন্তার কারণ ছিল। কিন্তু রাম সিং মরে গিয়ে রমেশ পাণ্ডেকে বিচলিত করে ফেলেছে। হাসপাতালে আলাপ হল লোকটার সঙ্গে। ডাক্তারের মতে, কারও পরামর্শে রাম সিং আমাশার রোগে কড়া ডোজের জোলাপের ট্যাবলেট খেয়েছিল। রমেশ পাণ্ডে বললেন, রাম সিং ভোরে তাঁকে বলেছিল আমাশা হয়েছে। কিন্তু হাতের কাছে তাকে পেয়ে জোর করে জিপ নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। পাণ্ডেজীর ধারণা, হনিমুনারদের কেউ ওকে জোলাপের ট্যাবলেট দিয়েছিল। তো ডাক্তারের মতে, অনেক সময় একটু জোলাপ নিলে আমাশা সেরে যায়। কিন্তু ডোজটা ছিল খুব কড়া। হিতে বিপরীত হয়ে গেছে।

রঘুবীর আস্তে বললেন, পাণ্ডেজি তাঁর বন্ধুর জন্য প্রচুর হুইস্কি, বিয়ার এবং সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক পাঠিয়েছেন। আজও ককটেল পার্টি হচ্ছে—উইথ ডিনার।

হওয়ারই কথা। খুনী ধরা পড়েছে। হনিমুনাররা নিজেদের নিরাপদ ভাবছে এবার।

রুদ্রসাব অ্যানাউন্স করছিলেন। কিন্তু কোথায় সে ধরা পড়ল সার?

সে নিজেই থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করেছে। তার আসল নাম বিকাশ সেন। ফিল্ম প্রোডিউসার।

ও মাই গড! কিন্তু কেন সে ঋতুপর্ণা রায়কে খুন করেছে?

কর্নেল খুব আস্তে বললেন, যথাসময়ে জানতে পারবে রঘুবীর! চলো! বড্ড ঠাণ্ডা এখানে।

লাউঞ্জে ঢুকে কর্নেল দেখলেন, পার্টি খুব জমে উঠেছে। যে-যার বউয়ের সঙ্গে নাচছে। শুধু চমনলাল দম্পতি এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন। তবে দেখার মতো দৃশ্য, সুভদ্রা ঠাকুর একা আপন মনে উদ্দাম নাচছেন। মুখে পাগলাটে হাসি।

কর্নেলকে দেখামাত্র সুভদ্রা ছুটে এলেন। ম্যান! ড্যান্স উইথ মি!

কর্নেল অগত্যা তাঁর সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন। চমনলাল দম্পতি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। পায়েল নাচ থামিয়ে বলল, হাই ওল্ড ম্যান! আই মাস্ট্ অফার ইউ এ ড্রিঙ্ক।

থ্যাঙ্কস্ ম্যাডাম!

অনির্বাণ হাসতে হাসতে বলল, আপনি মশাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনাকে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবতাতে থাকতে হয়। এঞ্জয় করতে হলে ভালোভাবে করুন! পায়েল, ওঁকে একটু স্কচ দাও। জনি ওয়াকার হুইস্কি মশাই! এ জিনিস খুব দুর্লভ এখানে!

পায়েল একটা টেবিলে সাজানো বোতল থেকে হুইস্কি আর সোডা ওয়াটার ঢালল। একটুকরো আইস কিউব ফেলে দিল গ্লাসে। তারপর কর্নেলের হাতে ধরিয়ে দিল। কর্নেল কাঁচুমাচু মুখে বললেন, ফর ইওর অনার মিস ব্যানার্জি! জাস্ট এক চুমুক খাব।

সুভদ্রা কর্নেলের হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে কার্পেটে ফেলে দিলেন। তারপর ধপাস করে একটা কুশনে বসলেন। সবাই হেসে উঠল।

পায়েল গ্লাসটা কুড়িয়ে নিয়ে একজন বিচেনবয়কে ইশারায় ডাকল। গ্লাসটা তাকে ধুতে দিয়ে সে আরেকটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। তারপর কর্নেলের দিকে এগিয়ে আসতেই সুভদ্রা ঝাঁপিয়ে এলেন। চিৎকার করে বললেন, নো! টেক্ অফ্ ইওর ডার্টি হ্যাণ্ড ফ্রম দিস সিম্বল অব হেভেন্‌লি বিইং।

অনির্বাণ বলল, লিভ ইট পায়েল! লেট্স্ ড্যান্স!

সুভদ্রা কর্নেলের হাত ধরে টেনে নিজের পাশে বসালেন। কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে। আমি খুনীকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম; কিন্তু জঙ্গলের আড়ালে থাকার জন্য চিনতে পারিনি। সে হতভাগিনী মেয়েটিকে ঠেলে নদীতে ফেলে দিচ্ছিল।

কর্নেল হাসলেন। খুনী তো ধরা পড়েছে!

পুলিসকে আমি বিশ্বাস করি না। তারা সব সময় ভুল লোককে ধরে। আমার স্বামী জিতেন্দ্রকে—বলেই সুভদ্রা নিজের মুখে হাত রাখলেন। থাক। আমি সে-সব কথা বলব না। জিতেন্দ্রর আত্মা আমাকে বলেছে, চুপ করে থাকো! কর্নেল সরকার! মেয়েটিকে আমি বাগানে একা বসে থাকতে দেখে সঙ্গে যেতে বলেছিলাম। ও যায়নি। গেলে মারা পড়ত না।

কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। রাত ন'টা পঞ্চাশ বাজে। সুভদ্রা ঠাকুর তাঁর কানের কাছে মুখ এনে আরও কী সব বলছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা ক্রমশ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছেন এবং তাঁর পাগলামি বেড়ে যাচ্ছে। কর্নেল হনিমুনারদের দেখতে থাকলেন। সোমক ও শ্রুতি, দীপক ও কুমকুম, অনির্বাণ ও পায়েল এবার নাচের জুটি বদলাল। সোমক ও পায়েল, দীপক ও শ্রুতি, অনির্বাণ ও কুমকুম জুটি হল।

রাত দশটায় কর্নেল লক্ষ্য করলেন, ম্যানেজার রঘুবীর রায় রিসেপশন কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে গেলেন। তারপর ঘুরে কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

কর্নেল উঠে গেলেন তাঁর কাছে। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ দুবে দলবলসহ লনে এগিয়ে আসছিলেন। রঘুবীরের চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। আস্তে বললেন, আবার পুলিস কেন কর্নেলসাব?

কর্নেল বললেন, তোমার চিন্তার কারণ নেই রঘুবীর।

মিঃ দুবে এবং তাঁর পুলিস সঙ্গীরা লাউঞ্জে ঢুকতেই নাচ থেমে গেল। দুবে একটু চড়া গলায় বললেন, প্লিজ স্টপ দ্যা মিউজিক!

সোমক এগিয়ে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করল। অনির্বাণ সহাস্যে বলল, ওয়েলকাম! ওয়েলকাম!

পুলিসের দলটি লাউঞ্জে ঢুকে চারদিক ঘিরে দাঁড়াতেই পায়েল ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, হোয়াট্ দ্যা হেল্ ইউ আর ডুইং?

মিঃ দুবে বললেন, আপনারা দয়া করে বসে পড়ুন।

অনির্বাণ হাসল। ঠিক আছে। পায়েল, আমার মনে হচ্ছে পুলিস আমাদের কাছে আরও কিছু জানতে চায়। আমরা পুলিসকে সহযোগিতা করব।

মিঃ দুবে কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, আপনার কিছু বক্তব্য আছে বলছিলেন কর্নেল সরকার! আপনি এবার তা বলুন!

সবাই চুপচাপ বসে পড়েছে। সবগুলি মুখে বিস্ময় এবং গাম্ভীর্য। কর্নেল বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টল্‌মেন! বিকাশ সেন ধরা পড়েছে সে-কথা আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন। তবু কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে। প্রথমেই আমি প্রশ্ন করছি সোমকবাবুকে। সোমকবাবু! কুমকুম সিনহা আজ মর্নিংয়ে যখন আপনাদের ধারিয়া ফলসে যাওয়ার জন্য ডাকতে যান, তখন কুমকুম আপনাকে বলেছিলেন, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব।'

সোমক আস্তে বলল, হ্যাঁ। সে তো আপনাকে বলেছি। আবার এ প্রশ্ন কেন?

তার মানে, তখনও ধারিয়া ফলসে গিয়ে ব্রেকফাস্টের প্ল্যান ছিল না! তাই না মিসেস সিনহা?

কুমকুম বলল, হ্যাঁ। কিন্তু ফলসের ওখানে পৌঁছে ঠিক হয়েছিল এখানে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। কারণ গুহাচিত্র দেখে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মনে আছে?

পায়েল বলে উঠল, একজনের সিদ্ধান্ত নয়। আমরা সবাই মিলে—

কর্নেল বললেন, মিসেস সিনহা এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমি চাই, যাঁকে প্রশ্ন করা হবে, তিনিই কথা বলবেন। প্লিজ অন্য কেউ ডিসটার্ব করবেন না। মিসেস সিনহা!

কুমকুম বিব্রতভাবে বলল, পায়েলদি হয়তো ঠিক বলেছেন।

কিন্তু কোনও প্রসঙ্গ উঠলে একজনই প্রথমে কথাটা তোলেন। তাই না মিসেস সিনহা।

হ্যাঁ। কিন্তু কে তুলেছিলেন কথাটা, মনে পড়ছে না।

ঠিক আছে। তো আপনি আজ বিকেলে আমাকে বলেছেন অনির্বাণবাবু জিপ নিয়ে ব্রেকফাস্টের খাবার আনতে গিয়েছিলেন। মিঃ রুদ্র! আপনি কোথায় খাবার আনতে গিয়েছিলেন?

অনির্বাণ বাঁকা হাসল। সেটা কি অন্যায় কিছু? এই এরিয়া আমার চেনা। ধারানগরে আমার কোম্পানির ব্রাঞ্চ আছে।

মিঃ রুদ্র! আপনার কোম্পানির নাম কী?

চয়নিকা ইনভেস্টমেণ্ট অ্যাণ্ড স্মল সেভিংস। অসংখ্য জায়গায় আমাদের ব্রাঞ্চ আছে।

তার মানে, আপনার কোম্পানি জনসাধারণের কাছে আমানত নেয় এবং সেই টাকা লগ্নি করে। এসব সংস্থার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়। আজকাল এ ধরনের প্রচুর সংস্থা সর্বত্র গড়ে উঠেছে। ন্যূনতম আমানত মাথা পিছু কত মিঃ রুদ্র?

এটা কি প্রাসঙ্গিক কর্নেল সরকার?

উত্তর দিন প্লিজ।

মিনিমাম পাঁচ টাকা। সুদসহ তিনবছরে তিনগুণ টাকা আমরা ফেরত দিই।

আসানসোলের একটা ব্যাঙ্কে আপনার নিজের নামে কত টাকা রেখেছেন মিঃ রুদ্র ?

অনির্বাণ রুষ্ট মুখে বলল, অ্যাবসার্ড ! এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মিঃ তুবে বললেন, আমরা জানতে পেরেছি আপনার ব্যক্তিগত আমানতের পরিমাণ প্রায় এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা।

তাতে কী ? ওটা কোম্পানির একটা প্রজেক্টের জন্য আলাদা জমা রাখা হয়েছে।

কর্নেল বললেন, পিয়ালি রায় সেই ব্যাঙ্কের এজেন্ট ছিল। তাই না মিঃ রুদ্র ?

হ্যাঁ। কিন্তু শয়তান বিকাশ সেন পিয়ালিকে—

জাস্ট এ মিনিট। মিস ব্যানার্জি! আপনি আমাকে বলছিলেন পিয়ালি এখানে ঋতুপর্ণা নাম নিয়ে মিঃ রুদ্রকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছিল। তাই না ?

পায়েল বলল, অনির্বাণ আমাকে কথাটা বলেছিল। এর বেশি কিছু জানি না।

সোমকবাবু ! এবার আপনাকে প্রশ্ন করছি। নদীর ধারে বসে থাকার সময় পিয়ালি ওরফে ঋতুপর্ণা হঠাৎ রাস্তার দিকে চলে গিয়েছিল। আপনি বলেছেন— আমাকে।

সোমক আস্তে বলল, হ্যাঁ।

শ্রুতি ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে বলল, কী দেখেছিলে বলছ না কেন ?

সোমক একটু ইতস্তত করে বলল, ঋতুপর্ণা—আই মিন পিয়ালি, ওভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় খুব অবাক হয়েছিলাম। অপমানিত বোধ করছিলাম। তো রাস্তায় কাকেও দেখে সে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটাকে অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না ! ভেবেছিলাম ওর স্বামীকে দেখতে পেয়ে ও চলে গেল আর গানে লোকটা সম্ভবত অন্য কেউ।

কর্নেল বললেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম হনিমুন লজের গেটের দিকে যে যেতে আপনি পিছু ফিরে কিছু দেখছিলেন !

সোমক কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না।

প্রাইভেট রোড থেকে হাইওয়ে এবং ব্রিজের একটা অংশ চোখে পড়ে সোমকবাবু !

হ্যাঁ। হাইওয়েতে অনেক গাড়ি যাতায়াত করছিল। কিন্তু আসলে আমি ঋতুপর্ণাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

আপনার স্ত্রীকে প্রশ্ন করছি! ড্রাইভার রাম সিংয়ের আমাশা হওয়ার কথা কোথায় প্রথম শুনেছিলে শ্রুতি?

ফলসে যাওয়ার সময়। সে রাস্তায় জিপ থামিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল।

তারপর? কতক্ষণ পরে সে ফিরেছিল?

মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়।

কেউ কি তাকে আমাশার ওষুধ দিতে চেয়েছিল তখন?

শ্রুতি তাকাল। একটু পরে বলল, না তো!

কর্নেল চমনলালের দিকে তাকালেন। চমনলালজি! আপনি এঁটো পেপার-কাপগুলো কুড়িয়ে আবর্জনার পাত্রে ফেলেছিলেন। আপনি আমাকে বলেছেন, আপনি দায়িত্বশীল নাগরিক। অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য—

চমনলাল দ্রুত বললেন, আমি এসব কাজ করে থাকি।

কর্নেল মিঃ দুবেকে ইশারা করলেন। দুবের হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল। ব্যাগ খুলে রুমালে মোড়া অস্ত্রটা তিনি কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল অস্ত্রটা বের করতেই লাউঞ্জে সকলের মধ্যে চমক খেলে গেল। কর্নেল বললেন, এটাই পিয়ালিকে হত্যার অস্ত্র। চমনলালজি! আপনি এটা প্রপাতের কাছে আবর্জনার পাত্রে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই না?

হ্যাঁ। আমি চমকে উঠেছিলাম ওটা দেখে। তবে আমি দায়িত্বশীল নাগরিক।

আপনি দায়িত্বশীল নাগরিক, তা ঠিক। তাই আপনার কাছে আবার প্রশ্ন তুলছি, আপনি কি কাকেও এটা ফেলতে লক্ষ্য করেছিলেন? কিংবা কেউ কিছু গোপনে আবর্জনার পাত্রে ফেলে দিল বলে আপনার কি সন্দেহ হয়নি?

বিজয়া দেবী বলে উঠলেন, আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে লাল বাধ্য নয়। আমাদের এখানে আসতে ভালো লাগে। যতদিন বাঁচব, ততদিন আসতে হবে। আমরা কোনও ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না। আমি লালকে খুব বকাবকি করেছি। সবকিছুতে ওর নাক গলানো অভ্যাস আছে। এটা মোটেও ভালো নয়।

চমনলালজি! আপনার কী বক্তব্য?

বিজয়া ঠিক বলেছে।

তার মানে, আপনি কাকেও এটা ফেলতে দেখেছিলেন!

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক মুখ নামিয়ে বললেন, সৎ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে

যে কর্তব্যটুকু পালন করা উচিত, তা করেছি কর্নেল সরকার! এর বাইরে এক পা বাড়ানো আমার উচিত হবে না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ধন্যবাদ! এবার আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই। মিঃ দুবে!

মিঃ দুবে নিঃশব্দে হেসে একপাটি লেডিজ স্লিপার বের করে দিলেন কর্নেলকে। বললেন, কর্নেল সরকার! ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের জুতো দেখানোর জন্য আগে ক্ষমা চেয়ে নিন!

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। তবে জুতোটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা পিয়ালি রায়ের জুতো। আপনারা বুঝতেই পারছেন, জুতোটা হত্যাস্থলেই পাওয়ার কথা এবং সেখানেই পাওয়া গেছে।

সোমক গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলল, কোথায় খুন করা হয়েছিল ওকে?

নদীর ওপারে। প্রপাতের নীচে যে জলাশয় আছে, তার একটা দিক একটু বেঁকে কোণ সৃষ্টি করেছে। সেখানেই জলের ধারে পাথরের ফাঁকে এটা পড়ে ছিল। হত্যাকারী পিয়ালিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে তার ডেডবডি জলে ফেলে দিয়েছিল। একপাটি জুতো খসে পড়াটা লক্ষ্য করেনি।

সুভদ্রা ঠাকুর কর্কশ কণ্ঠস্বরে বললেন, আমি ডেডবডি ফেলে দেওয়া দেখতে পেয়েছিলাম এপার থেকে। কিন্তু যে ফেলে দিচ্ছিল, তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে ছিল জঙ্গলের আড়ালে। জঙ্গলে প্রচুর লাল ফুল ফুটে ছিল। জিতেন্দ্রর আত্মা আমাকে তক্ষুনি বলল, একটা কিছু করো! তো সেই সময় কর্নেল সায়েবকে হেঁটে আসতে দেখলাম। তাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফাদার পিয়ার্সনের পার্কে যে বেদিতে মেয়েটি এই ছেলেটির সঙ্গে বসে ছিল—নাহ্! আর কিছু বলব না। জিতেন্দ্রর আত্মা আমাকে নিষেধ করেছে। কারণ এখানে আমাকে—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ একটা সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড! পিয়ালি রায় অনির্বাণবাবুকে ব্ল্যাকমেইল করত। তার কারণ একটু আগে আমি জানিয়েছি। অনির্বাণবাবুর কাজটা বেআইনি। জনসাধারণের আমানতের টাকা নিজের নামে মফঃস্বল শহরের একটা ব্যাঙ্কে জমা রাখার কথা জানাজানি হলে হইচই পড়ে যেত।

অনির্বাণ দ্রুত বলল, তেমন কিছু ঘটলে টাকাটা আমি আমার সংস্থার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিতাম।

কর্নেল বললেন, এনিওয়ে! পিয়ালি এখানে একা আসতে সাহস পায়নি। তাই তার ফিয়াসেঁ বিকাশ সেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পিয়ালি বোকার মতো ফাঁদে পা দিল!

পায়েল বলল, ফাঁদ?—বিকাশ বখরার লোভে তাকে মেরে ব্যাঙ্কের ডকুমেন্ট আত্মসাৎ করেছে!

না মিস ব্যানার্জি! সেই সুযোগ বিকাশ সেন পাননি। ডকুমেন্টের জেরক্স কপি পিয়ালির স্যুটকেসে পাওয়া গেছে। এনি ওয়ে! এবার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসা যাক। আমরা কুমকুম সিনহার কাছে জেনেছি অনির্বাণবাবু ধারিয়া ফলসে সবাইকে রেখে জিপ নিয়ে খাবার আনতে গিয়েছিলেন। তাই না?

অনির্বাণ বলল, হ্যাঁ। বলেছি তো সে কথা।

কিন্তু ড্রাইভার রাম সিংয়ের আমাশা। তাই আপনি একা জিপ ড্রাইভ করে গিয়েছিলেন।

কিছু অন্যায় করিনি!

দীপকবাবু! আপনি একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাই না?

দীপক বলল, তাতে কী?

আপনার সঙ্গে নানারকম ওষুধ সবসময় রাখা অভ্যাস। বিশেষ করে বাইরে গেলে—

দীপক কর্নেলের কথার ওপর বলল, অনির্বাণদা ড্রাইভারের আমাশার ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বললাম, আছে। কিন্তু—

কিন্তু অনির্বাণবাবু জোলাপের ওষুধই চেয়ে নিয়েছিলেন। তাই না?

দীপক চমকে উঠল। বলল, হ্যাঁ।

এবার আসছি অন্য প্রসঙ্গে। পিয়ালির স্যুটকেসে কয়েকটা চিঠি পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক একটা ইনল্যাণ্ড লেটারে কেউ তাকে ধারানগর এরিয়ায় হনিমুন লজে ডেকেছিল। চিঠির তলায় যে সইটা আছে, তা অস্পষ্ট। চিঠিতে এক লাখ টাকা নগদ দেওয়ার প্রস্তাব আছে। এটাই ফাঁদ! পিয়ালি ওই বাগানে অপেক্ষা করছিল। তারপর সে দেখেছিল, যে তাকে টাকা দেবে সে আসছে না। এদিকে তার সঙ্গী বিকাশ সেন খুব ভোরে উঠে লনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। তখন তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। জগদীশ এটা লক্ষ্য করেছিল। হুমকির পর বিকাশ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নিপাত্তা হয়ে যান। তিনি এমন সাংঘাতিক কিছু আশা করেননি। তিনি তা পুলিসকে

বলেছেন। তিনি আড়াল থেকে লক্ষ্য রেখে বেড়াচ্ছিলেন। পিয়ালিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাছাড়া তিনি আমার পরিচয় জানতেন। আমাকে ফোনে জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গিনী খুন হয়েছে।

অনির্বাণ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, কী বলতে চান আপনি?

কর্নেল হাসলেন। বলতে চাই, ধারিয়া ফলসে গিয়ে সেখানেই ব্রেকফাস্ট্ করার কথা তুলে এবং রাম সিংকে বেশি ডোজের জোলাপের ওষুধ খাইয়ে আপনি একা জিপ নিয়ে পিয়ালির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিলেন। আপনি জিপ দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন হাইওয়ের মোড়ে। তারপর প্রাইভেট রোডে হেঁটে আসার সময় পিয়ালিকে সোমকবাবুর সঙ্গে দেখতে পান। নিশ্চয় তাকে ইশারায় ডেকেছিলেন আপনি। তারপর তাকে কথায় ভুলিয়ে জিপে তুলে ফলসের দিকে ফিরে যান এবং আগে থেকেই বেছে রাখা জায়গায় জিপ ডাইনের ঘাস জমিতে নামিয়ে পিয়ালির সঙ্গে বোঝাপড়ার ছলে লেকের কাছে নিয়ে যান। আচমকা তাকে গুলি করে জলে ফেলে দেন। তারপর ফের জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে ধারানগরে খাবার আনতে যান। ফিরে গিয়ে একসময় অস্ত্রটা আবর্জনার পাত্রে ফেলে দেন। চমনলালজি! আপনি আর চুপ করে থাকবেন না। আপনি সৎ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক!

চমনলাল বিব্রতভাবে বললেন, হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওভাবে লুকিয়ে মিঃ রুদ্র কী জিনিস আবর্জনার পাত্রে ফেললেন?

সুভদ্রা ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন, ওর গায়ে লাল শার্ট ছিল! ওই লোকটার গায়ে!

অনির্বাণ দাঁড়িয়েই ছিল। দু'জন পুলিস অফিসার দুদিক থেকে তার দুটো হাত ধরে পেছনে টেনে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। লাউঞ্জে ভয়াবহ স্তব্ধতা। তারপর পায়েল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সোমক গর্জন করে বলল, শাট আপ!

বিশ্বাস করো সোমক! আমি এত সব জানতাম না। কল্পনাও করিনি। অনির্বাণ আমাকে যা বলেছিল, তা শুনে আমার সিম্প্যাথি জেগেছিল ওর ওপর। দ্যাট্স অল!

শ্রুতি পায়েলের হাত ধরে টানল। পায়েলদি! প্লিজ ফরগেট ইট। অনির্বাণ-দাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। আমার দাদার সঙ্গে একসময় বন্ধুতা ছিল ওর। হি ইজ এ ন্যাস্টি অ্যাণ্ড ফেরোশাস ম্যান!

মিঃ দুবে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল সহাস্যে বললেন, চিয়ার্স আপ হনিমুনারস !. না—রমেশ পাণ্ডের জন্য কারও ভয়ের কারণ নেই। তাঁর ড্রাইভারকে যে অতিরিক্ত জোলাপ খাইয়ে মেরে ফেলেছে, তার প্রতি উনি ভীষণ ক্রুদ্ধ। এবার তাঁকে আমি কথাটা জানানোর দায়িত্ব নিলাম। আপনারা নির্ভয়ে হনিমুন পালন করুন। আর মিস ব্যানার্জি !

পায়েল কান্না চেপে বলল, আমি কলকাতা ফিরে যাব।

সুভদ্রা ঠাকুর উঠে এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন? তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তোমায় ডাকিনীবিদ্যা শেখাব। এই বিদ্যার জোরে বদমাস পুরুষগুলোকে তুমি জব্দ করে রাখবে।

ম্যানেজার রঘুবীর সবিনয়ে বলল, আপনারা যদি দয়া করে ডিনার খেয়ে নেন, ভালো হয়।

কর্নেল দেখলেন, পায়েল সুভদ্রার টানে উঠে গেল। দুজনে ডাইনিংয়ে ঢুকে মুখোমুখি বসল। পায়েল ব্যানার্জি ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে।

এবার আর অন্য কিছু নয়। নীলসারস দম্পতিকে ক্যামেরাবন্দী করার জন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করবেন। তিনি চমনলাল দম্পতির সামনে গিয়ে বললেন, বসতে পারি এখানে?

দুজনে একগলায় বললেন, বসুন!

ব্রিফকেস রহস্য

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নীতার।

টেলিফোনটা বিদেশি। এর শব্দটা চাপা। কিছুটা জলতরঙ্গের বাজনার মতো। কিন্তু নিঝুম নিষুতি রাতে সেই বাজনা বিরক্তিকর উপদ্রব।

সাড়া না দিলে সব টেলিফোন একসময় থেমে যায়।

কিন্তু থামছে না। ক্রমাগত রিং হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ নীতার খেয়াল হল, এই নাম্বারটা প্রাইভেট। খুব ঘনিষ্ঠ ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়।

সে মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপল। ঘড়ি দেখল। রাত একটা দশ।

একটু দ্বিধা, একটু অস্বস্তি—তারপর সে রিসিভার তুলে সাড়া দিল।

'নীতা সোম?'

কোনও পুরুষের কণ্ঠস্বর; চাপা আর কর্কশ। নীতা বলল, 'হু ইজ ইট?'

'কাল আপনি আউটডোর শ্যুটিংয়ে যাচ্ছেন। যাবেন না।'

নীতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'হোয়াট দ্য হেল আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? কে আপনি?'

'আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? আমি বলছি, আপনি কাল আউটডোর শ্যুটিংয়ে যাবেন না। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

নীতা একটু দমে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না। দুঃস্বপ্ন দেখছে কি?

কিন্তু আবার সেই চাপা রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'হ্যালো। আর ইউ দেয়ার?'

'কে আপনি?'

'চিনবেন না। আপনার ভালোর জন্য বলছি—'

'আমার এই নাম্বার কোথায় পেলেন?'

'পেয়েছি। মিস সোম! আপনি কাল আউটডোর শ্যুটিংয়ে চণ্ডীতলা যাবেন না।'

'ইজ ইট এ থ্রেটনিং?'

'দ্যাট ডিপেণ্ডস। আপনি আপনার ডাইরেক্টরকে লোকেশন চেঞ্জ করতে বলুন।'

কানেকশন কেটে গেল। নীতা কয়েকবার 'হ্যালো' বলল। উত্তেজনা আর অস্বস্তিতে অস্থির নীতা সোম রিসিভার মুঠোয় চেপে ধরল। তারপর বিছানা থেকে উঠে বসল।

এয়ারকণ্ডিশনারের স্নিগ্ধহিম ঘরে আরাম ছড়িয়ে রেখেছিল। সেই আরাম তছনছ করে দিয়েছে মধ্যরাতের একটা অদ্ভুত উপদ্রব। রিসিভারটা বালিশের পাশে রেখে দিল সে, পাছে আবার আততায়ী কণ্ঠস্বর হানা দেয়।...

রাত একটা পঁচিশে নীতা একটা নাম্বার ডায়াল করল। দুবার রিং হওয়ার পর সাড়া এল। অবিনাশের জেগে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নীতা আস্তে বলল, 'অবিনাশদা। নীতা বলছি।'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ। তুমি এখনও জেগে আছ নাকি?'

'ঘুম আসছে না। আপনি এখন কী করছেন।'

অবিনাশ ঘোষালের হাসির শব্দ ভেসে এল। 'আমার যা করা উচিত। শুভকে নিয়ে স্ক্রিপ্টটা ফাইনাল করছি। জাস্ট এ টাচ আপ। শুভ অবশ্য ঘুমে ঢুলছে। ওকে বাড়ি ফিরতে দিইনি। জানো? ওর বউ তিনবার রিং করেছিল। তো কী ব্যাপার? তোমার ঘুম আসছে না কেন?'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর ঘুম আসছে না?'

'ও দুষ্টু মেয়ে। তাই আমাকে—'

'না অবিনাশদা।'

অবিনাশ দ্রুত বললেন, 'এটা হয়। র‍্যাদার—এ সাইকোলজিক্যাল প্রব্লেম। তুমি শাইনিং স্টার। তোমার অবচেতনায় একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থাকতে বাধ্য। বিশেষ করে এ ধরনের প্রফেশনে তো—না? তুমি তাই বলে ঘুমের বড়ি-টড়ি খেয়ো না।'

'অবিনাশদা। কাল আমরা কোথায় যেন যাচ্ছি?'

'বেশি দূরে নয়। তোমাকে তো বলেছি মাত্র ঘণ্টাতিনেকের জার্নি। খুব শান্ত নির্জন জায়গা।'

'আমরা কাল যাচ্ছি?'

'কী আশ্চর্য। নীতা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এত রাত্রে হঠাৎ—এনিথিং রং? নীতা।... হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!'

'অবিনাশদা। আই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল।'

'কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ করছে?'

'কেমন যেন একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে।'

'আনক্যানি ফিলিং। তার মানে?'

'আচ্ছা অবিনাশদা, শ্যুটিং কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিতে অসুবিধে কী?'

'কী অদ্ভুত কথা বলছ তুমি! আজ বিকেলে আমার টিম সেখানে রওনা হয়ে গেছে। আর রাত দুপুরে তুমি বলছ—ওঃ নীতা। প্লিজ পাগলামি করো না। শোনো আমি নিজে দেখে এসেছি। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করব না। তাছাড়া স্টোরিতে ঠিক যেমন একটা বাড়ির কথা ভেবেছিলাম, বনেদি অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির বাগানবাড়ি—নদী বা ঝিল, প্রচুর গাছপালা। আরও একটা ফেসিলিটি আছে। ইলেকট্রিসিটি। একটা টেলিফোন পর্যন্ত। আসলে বাড়ির মালিক একজন এক্স এম পি। নাইস ওল্ড ম্যান।' অবিনাশ আবার হেসে উঠলেন। 'না—তিনি ড্রাকুলা নন, সো ম্যাচ আই ক্যান অ্যাসিউর ইউ? ও কে? রাখছি।'

'অবিনাশদা!' বলেই নীতা থেমে গেল। সে জানে, অবিনাশ ঘোষাল জেদি ও খেয়ালি মানুষ। কথাটা শুনলে হয়তো এখনই ছুটে আসবেন। ফিল্মমেকার হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। পুলিস-প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে ফেলবেন। কিন্তু তাতে নীতার অস্বস্তি ঘুচবে না। একটা লোক যে-ভাবে হোক, তার প্রাইভেট ফোন নাম্বার জেনেছে এবং প্রকারান্তরে তাকে হুমকিই দিয়েছে।

রাত একটা দশে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কেউ হুমকি দিয়েছে। এটাই অস্বস্তিকর।

'হ্যালো···হ্যালো·· হ্যালো! নীতা! কথা বলছ না কেন?'

'অবিনাশদা, আমরা সকাল আটটায় যাচ্ছি। তাই না?'

'তোমার উঠতে দেরি হবে। এই তো? ঠিক আছে। মেক ইট নাইনও ক্লক।'

নীতা চুপ করে থাকল। ঠোঁট কামড়ে ধরে আবার সে বোবা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'নীতা হোয়াটস রং?'

'কিছু না হঠাৎ ঘুম ভেঙে—'

'শোনো। একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নাও। চিয়ার আপ। ছাড়ি ?'...

নীতা আগের মতো বালিশের পাশে রিসিভার রেখে দিল। তারপর উঠে গিয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করল।

রাত একটা পঞ্চাশ মিনিটে মাথার ভেতর তীব্র উত্তেজনা তাকে নাড়া দিল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করল। তারপর বিছানায় হেলান দিয়ে বসে পাতা ওল্টাতে থাকল। একটা নাম্বার খুঁজছিল অভিনেত্রী নীতা সোম।

তার হাত কাঁপছিল। সেই হাতে নাম্বারটা ডায়াল করল। প্রায় এক মিনিট ধরে রিং হওয়ার পর ঘুমজড়ানো গলায় সাড়া এল। 'ইয়া ?'

নীতা বলল, 'রাত্রি ? আমি নীতা বলছি। তোকে ডিসটার্ব করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু—'

'কে ? নীতা—নীতা কী ?'

'তুই কি জেগেছিস, না ঘুমের মধ্যে কথা বলছিস ? আমি নীতা।'

'ও। তুই ? তোর ভয়েস এমন কেন ? মাই গুডনেস! দুটো বাজতে চলল। তুই নিশ্চয় কোনও স্টুডিও থেকে ফোন করছিস।' রাত্রির হাসির শব্দ ভেসে এল। 'বাহ্। নিজে ঘুমনোর চান্স পাচ্ছে না বলে আমাকে টিজ করার ধান্দা ?'

'রাত্রি! দিস ইজ সিরিয়াস। আমি বাড়ি থেকে বলছি।'

'সিরিয়াস মানে ? কোনও মিসহ্যাপ নাকি ?'

'আগে শোন, যা বলছি।' নীতা শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলল। 'শোনার পর তুই বলবি আমার কী করা উচিত।'

'বল। কিন্তু তুই কি অসুস্থ ? নাকি কার পাল্লায় পড়ে ড্রিঙ্ক করেছিস ?'

'একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়েছি।'

'এতেই ? ও কে। বল।...ওয়েট, ওয়েট, তুই কি এখন একা আছিস ?'

নীতা রেগে গেল। শিট! আই অ্যাম নট এ হোর ইউ নো।'

'ঠিক আছে বাবা। মুখখিস্তি করতে হবে না। বল, কী বলবি।'

নীতা হঠাৎ শক্ত আর শান্ত হয়ে গেল। ঘটনাটি বলতে থাকল। তার কণ্ঠস্বর অবশ্য মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছিল। রাত্রির সাড়া না পেলেই তাকে ডাকছিল। কথা বলতে বলতে নীতা টের পাচ্ছিল উত্তেজনার চাপে একটু বেশি ব্র্যাণ্ডি খেয়ে ফেলেছে। ক্রমে তার স্নায়ু কী এক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

রাত্রি বলল, 'ও কে। তুই এখন শুয়ে পড়। আর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে

দে। পরে সময়মতো এক্সচেঞ্জ থেকে নাম্বারটা বদলে নেওয়ার ব্যবস্থা করবি। আমি মর্নিংয়ে—ধর, আটটার পর যাচ্ছি। তখন কথা হবে।'

'এখনই বল।'

'শাট আপ। শুয়ে পড় বলছি। আর রিসিভারটা—ডোণ্ট ফরগেট।'

নীতা রিসিভারটা মেঝেয় ফেলে দিল। কার্পেটে অদ্ভুত শব্দ হল। হাত বাড়িয়ে কয়েকবার চেষ্টার পর সে টেবিলল্যাম্পের সুইচটা খুঁজে পেল এবং অফ করে দিল। ঠিক ঘুম নয়, ঘুমের মতো গাঢ় একটা আচ্ছন্নতা তার চেতনার ওপর চেপে বসছিল।

ভোরের দিকে একবার ঘুম ভেঙেছিল। শীত করছিল। সে চাদরটা টেনে গায়ে চাপাল। এয়ারকণ্ডিশনার বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করল না।

তার শরীর জুড়ে অবসাদ। এ শরীর যেন তার নিজের নয়। আর তার মনও যেন তার নিজের মন নয়।

নীতা সোম অলস দৃষ্টিপাতে নিজের জীবনকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে দেখছিল…

॥ দুই ॥

সৌম্য ও অরিত্র খুব ভোরে ঝিলের জলে রোয়িং করছিল।

বাউণ্ডারি ওয়ালে ঘেরা প্রায় তিরিশ একর বাগানবাড়ির পূর্বসীমানায় একতলা আউটহাউস। তার নীচে পুরনো ঘাট। এই শরতের ঝিলের জল ঘাটের বেশ কয়েকটা ধাপ বুকের তলায় নিয়েছে।

ঝিলটা এখানে বিস্তীর্ণ। উত্তরে সাদাফুলে ভরা ঘন কাশবন। দক্ষিণে বাঁধের গায়ে এলোমেলো জঙ্গল। পশ্চিমে কিছুটা দূরে হাইওয়ের ওপর উঁচু ব্রিজ। পূর্বে ঝিলটা সংকীর্ণ হতে হতে বাঁক নিয়েছে। সেদিকে এখন নীলচে কুয়াশার পর্দা ঝুলছে।

এক চক্কর রোয়িং করে সৌম্য ঝিলের মাঝামাঝি পৌঁছে বলল, 'এনাফ। একটু রেস্ট নেওয়া যাক।'

অরিত্র বলল, 'এই ঝিলের মালিকও কি তোমার মামাবাবু?'

সৌম্য হাসল। 'নাহ্। ফিশারিজ ডিপার্টমেণ্ট। তবে এটা আসলে কোনও পুরনো নদীর—কী বলব? স্মৃতিরেখা।'

'রেখাটা ঠিক ফিট করছে না।'

'করবে। আরও পুর্বে গেলে।'

'চলো, যাই।'

'যাওয়া যাবে না। জাল পাতা আছে। ওদিকটায় মামাবাবুর তদ্বিরে ফিশারিজ কোঅপারেটিভ হয়েছে।'

'এই ঝিলটার কোনও নাম থাকা উচিত।'

'আছে। ডাইনির ঝিল।'

'সে কী।' অরিত্র হেসে ফেলল। 'এমন সুন্দর ঝিলের সঙ্গে ডাইনি-ফাইনির কী সম্পর্ক?'

'গ্রাম্য সুপারস্টিশন। ছোটবেলায় দিদিমার কাছে সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক গল্প শুনেছি। জেলেরাও নাকি সন্ধ্যার পর এদিকে মাছ ধরতে আসত না। ওই ব্রিজ পেরিয়ে গেলে একটা পুরনো শ্মশান আছে। কালীমন্দির ছিল। এখনও তার চিহ্ন আছে। সব মিলিয়ে একটা সুপারস্টিশন তৈরি হয়েছিল।'

'তুমি তো মাঝেমাঝে এখানে এসে থাকো বলেছিলে।'

'আসি। মা মামাবাবুর দেখাশোনার জন্য এখানেই থাকেন। তাই আসতে হয়। তা ছাড়া আমার ভালোও লাগে। বিশেষ করে জ্যোৎস্নারাতে ঝিলের জলে রোয়িং—জাস্ট ইমাজিন ইট।'

'তোমার ভয় করে না?'

'নাহ্।'

'তুমি একা?'

'তোমার মতো আমার কোনও স্মার্ট গার্লফ্রেণ্ড নেই। থাকলেও তাকে এখানে আনা যেত না।'

অরিত্র কৌতুক গায়ে নিল না। বলল, 'এই বোটটা তা হলে তুমিই তৈরি করিয়েছ?'

'না। এটা মামাবাবুর বোট। তাঁর রোয়িংয়ের হবি ছিল।'

'উনি কি হুইলচেয়ারে বসেই রোয়িং করেন?'

'রিস্ক আছে। চাইলেও মা বাধা দেবেন।

'ওঁর মাঝে মাঝে ক্র্যাচ ব্যবহার করা উচিত। সবসময় হুইলচেয়ার ব্যবহার করা ঠিক নয়।'

'করেন। বাথরুমে গেলে বা শোওয়ার সময়।'

'নীচে নামেন না?'

'দ্বারিককে দেখেছ। ও একটা দৈত্য। হুইল চেয়ারসুদ্ধু তুলে মামাবাবুকে বাগানে পৌঁছে দেয়। তারপর হোল এরিয়া চক্কর দিয়ে বেড়ান। বডিগার্ড জনি।'

'জনি?'

'অ্যালসেশিয়ান। কোনও আউটসাইডারকে বরদাস্ত করে না।'

অরিত্র ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'বটুকদা বলছিল, কোথায় নাকি প্লেন-ক্র্যাশ হয়েছিল। শুধু তোমার মামাবাবু বেঁচে যান।'

'হ্যাঁ। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে লণ্ডন যাচ্ছিলেন। ইতালির ওই এরিয়ায় তখন রাফ ওয়েদার। প্লেনটা ক্র্যাশল্যাণ্ডিং করেছিল।' সৌম্য একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করেছি, মামাবাবুর একটা ইন্সটিংকট আছে—র‍্যাদার এ সিক্সথ সেন্স। ঠিক সময়ে এমার্জেন্সি ডোর খুলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ওঁর মুখেই শুনবে। খুব স্ট্রেঞ্জ অ্যাণ্ড থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স। চলো। আর এক চক্কর ঘুরে আসি।'

'থাক। আমি এবার একটু ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করব।'

দুজনে বোট নিয়ে ঘাটের দিকে এগোল। সৌম্য বলল, 'আচ্ছা, মাথায় টাক পেল্লায় গোঁফ ওই ভদ্রলোক কে?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি? খুব মালদার পার্টি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা আছে। ফরেন ফিল্ম মার্কেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অবিনাশদা ওঁকে পেয়ে বসেছেন, নাকি উনিই অবিনাশদাকে পেয়ে বসেছেন, আমি জানি না।'

'নাম কী ভদ্রলোকের?'

'রমেশ ভার্মা।'

'অবাঙালি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কথা বলে বুঝতে পারবে না। তবে ভদ্রলোকের একটা গুণ অস্বীকার করা যাবে না। আর্টফিল্ম বুঝুন বা না বুঝুন, ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্স ইণ্ডিয়ান ফিল্মের কাছে কী চায়, সেটা দারুণ বোঝেন!'

'অবিনাশদা বলছিলেন, তাঁর এ ছবির থিম ডেকাডেন্স অব ইণ্ডিয়ান ফিউ-ড্যালিজম। এ কিন্তু বস্তাপচা হয়ে গেছে।' সৌম্য হাসতে হাসতে বলল। 'আমার ভয় করছে। মামাবাবুকে না অ্যাপ্রোচ করে বসেন। মামাবাবু কোনও কোনও

ব্যাপারে ভীষণ রিঅ্যাক্ট করেন।'

'অবিনাশদা তো এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ। আলাপ করেও গেছেন। কিন্তু—'

সৌম্য ঘাটে লাফ দিয়ে নেমে একটা লোহার আংটার সঙ্গে বোটের দড়িটা বাঁধল। অরিত্র নেমে এসে বলল, 'কিন্তুটা হচ্ছে এই যে, আমি স্টোরিলাইনটাই জানি না। আমার রোলটাই বা কী, তাও জানি না।'

'নীতা সোম জানে। গ্যাটস অল।'

'গ্যাই আই ভেরি মাচ ডাউট।'

'জানে না বলছ?'

অরিত্র খুবই আস্তে বলল, 'অবিনাশদার একটা ছবিতে আমি কাজ করেছি। একটা মাইনর রোলে। সে-ও প্রায় একবছর আগে। বড় পর্দার ছবির। এই ছবিটা ছোট পর্দার জন্য। টিভি ফিল্ম।'

সৌম্য ওর দিকে তাকাল। 'তাতে কী?'

'ছোট পর্দার জন্য এই লোকেশানের কী দরকার ছিল?'

'বুঝলাম না।' অরিত্র ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে জগিংয়ের ভঙ্গিতে এক্সারসাইজ করছিল। সৌম্য আবার বলল, 'কত বিখ্যাত টিভি ফিল্ম আউটডোর লোকেশানে তোলা হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের সদ্গতি।'

অরিত্র বলল, 'পরে বলব।'

সৌম্য শর্টস খুলে ঘাটের মাথায় রাখা প্যান্ট পরে নিল। তারপর পায়ে চটিজোড়া গলিয়ে নিল। কিছুক্ষণ অরিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সে ঘাটের মাথায় বসল।

একটু পরে আউটহাউসের একটা ঘরের জানলা থেকে বটুকবাবু ডাকলেন, 'সৌম্য।'

সৌম্য ঘুরে বসল। বলল, 'উঠেছেন দেখছি। রাতে বলছিলেন, আটটার আগে ওঠেন না।'

'উঠলাম। তো অরিত্র বাদরের মত লাফায় ক্যানে?'

'এটাই নাকি অরিত্রের ফ্রিহাণ্ড এক্সারসাইজ।'

'খাইছে।'

একটু পরে বটুকবাবু ডোরাকাটা রাত-পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন। কাঁধে তোয়ালে। হাতে সাবান এবং পেস্টলাগানো টুথব্রাশ। সৌম্য বলল, 'আপনি

কি ঝিলের জলে স্নান করবেন নাকি? না বটুকদা। জলে ভীষণ জোঁক আছে। বিলিভ মি।'

'আরে। ঘাট আছে। স্নান করা যাইব না? কও কী?'

'সত্যি বলছি। ঘাটটা শুধু রোয়িংয়ের জন্য। দাদামশাইয়ের আমলে নাকি এখানে পানসি বাঁধা থাকত। পানসি চেপে হাঁস মারতে যেতেন। মামাবাবুর একেবারে মডার্ন চালচলন।'

বটুকবাবু বেজার মুখে বললেন, 'রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। মশারি। তার ওপর হঠাৎ-হঠাৎ কারেণ্ট বন্ধ।'

অরিত্র আসন করার ভঙ্গিতে বসল। বলল, 'মশা এবং জোঁক। সাপও আছে বটুকদা। তা ছাড়া এই ঝিলটার নাম ডাইনির ঝিল। সাবধান।'

'হঃ।' বলে বটুকবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বটুক দত্ত বাংলা সিনেমার ভাষায় ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক। তাছাড়া তাঁকে এই টিমের সবরকম দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আউটহাউসের মধ্যিখানে একটা চওড়া করিডর। তার একদিকে প্রায় হলঘরের মতো বড় একটা ঘর। অন্যদিকের ঘরটা ছোট। বড় ঘরটার লাগোয়া বাথ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন। কাল দুপুরে সৌম্য এসে সব সাফসুতরো করিয়েছিল। সামনে খুঁটি পুঁতে তেরপল টাঙিয়ে অস্থায়ী কিচেনের ব্যবস্থাও হয়েছে। ঘাসের ওপর একটা লিমুজিন এবং একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। একসময় ওখানে ফুলবাগিচা ছিল। এই আউটহাউসে বারীন্দ্রনাথের গণ্যমান্য বন্ধুরা এসে থাকতেন। এখান থেকে সুরকি-বিছানো সংকীর্ণ একটা রাস্তা দোতলা বাগানবাড়ির পোর্টিকোর পাশ দিয়ে ঘুরে পশ্চিমের ফটকে পৌঁছেছে। বিশাল ফটকের পর একটা প্রাইভেট রোড এগিয়ে গিয়ে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে। সেখানে একটা মরচেধরা লোহার খুঁটির মাথায় আটকানো ফলকে লেখা 'প্রাইভেট রোড' কথাটা ক্ষয়ে গেছে।'

বাড়িটার নাম 'বিশ্রাম'। বারীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন চণ্ডীতলা মহলের জমিদার। এটা ছিল আসলে তাঁর কাছারিবাড়ি। সেই আমলে চণ্ডীতলা ছিল জেলাবোর্ডের পিচরাস্তার ধারে একটা সমৃদ্ধ গ্রাম। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে চণ্ডীতলা মফস্বল শহর হয়ে উঠেছে। প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে ঝিলের ধারে এই নিরিবিলি পরিবেশে উঁচু তিরিশ একর মাটি তাঁকে টেনেছিল। বারীন্দ্রনাথের বাবা সৌরীন্দ্রনাথ হাওয়া বুঝে চলতেন। স্বাধীনতার আগেই

রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাবার কাছারিবাড়ি দ্রুত বাউণ্ডারি ওয়ালে ঘিরে ফেলেন। স্বাধীনতার পর ভোটে জিতে মন্ত্রী হন। আত্মরক্ষার একটা লড়াই।

বারীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। তাঁর কিছু আদর্শবাদ ছিল। তাঁর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া সেই আদর্শবাদের তাগিদে। তাঁর পার্টি তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। লোকসভার আসনে তিনি বিপুল গরিষ্ঠতায় জিতে যান। কিন্তু তারপর তাঁর মোহভঙ্গ হতে থাকে। টার্ম শেষ হওয়ার পর আর সক্রিয় রাজনীতি করেননি। ক্রমশ নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিলেন। এলাকায় নানা রকম সমাজসেবার কাজে নামেন। দু বছর আগে তাঁর জীবনে ঘটে যায় আকস্মিক এক দুর্বিপাক।....

অরিত্র তার এক্সারসাইজ শেষ করে বলল, 'ঝিলের জলে সত্যি জোঁক আছে নাকি?'

সৌম্য বলল, 'আছে। তুমি এক মিনিট জলে পা ডুবিয়ে দেখে নিতে পারো।'

'তোমার মামাবাবু কি জোঁক পোষেন?'

সৌম্য হাসল। 'একটা গল্প কিন্তু চালু আছে।'

'কী গপ্প?'

'দাদামশাইয়ের বাবা নাকি ঝিলে জোঁক ছেড়েছিলেন। প্রজারা বদমাইশি করলে ঝিলের জলে তাদের ফেলে দিতেন। তারা রক্তশূন্য হয়ে মারা পড়ত। এই জোঁকগুলো সেই থেকে বংশানুক্রমে ম্যানইটার হয়েছে।'

'জোঁক নয় তাহলে। জোক!'

'গপ্পটা সত্যি হতেও পারে। আগের দিনে কোনও কোনও জমিদার মূর্তিমান টেরর ছিল!'

সৌম্য উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে বলল, 'ফিল্মের ব্যাপারে কি যেন বলছিলে?'

'বলেছি তো। পরে বলব।'

'জাস্ট একটু হিন্ট দাও না?'

'প্লিজ সৌম্য। ইনসিস্ট কোরো না।' অরিত্র তার একটা হাত ধরে পা বাড়াল। তারপর আউটহাউসের করিডরে ঢুকে বলল, 'তোমার মামাবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। অবিনাশদা এসে গেলে আর সুযোগ পাব না।'

'আচ্ছা দেখছি।' বলে সৌম্য এগিয়ে গেল। অরিত্র তাকে একটা অস্বস্তিতে

ফেলে দিয়েছে।

হলঘরে ঢুকে সে দেখল, দ্বারিক আর বাবুরাম ঝাড়পোঁছে ব্যস্ত। সুদক্ষিণা সিঁড়ির ধাপে নির্দেশ দিচ্ছেন। সৌম্যকে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে। ডাইরেক্টর ভদ্রলোক কখন পৌঁছুবেন বলেছেন?'

'এগারোটা নাগাদ। কেন?'

'আগেভাগে সব সাজিয়েগুছিয়ে রাখাই ভালো। কিন্তু একটা কথা ভাবছি। চল, তোকে দেখিয়ে নিই।'

সুদক্ষিণা নেমে এসে দক্ষিণের একটা ঘরে ঢুকলেন। সৌম্য দেখল, দরজায় সাবেক আমলের ভেলভেটের নকশাকাটা পর্দা ঝোলানো হয়েছে। ঘরে ঢুকে সুদক্ষিণা বললেন, 'এই ঘরে দেশের বিখ্যাত লোকেরা এসে থেকেছেন। আমি ভাবছি, তোদের হিরোইন এসে যদি বলে, এ ঘর তার পছন্দ নয়? ফিল্মের মেয়েদের একটু ডাঁট হয়।'

সৌম্য একটু হেসে বলল, 'সে অবিনাশদা দেখবেন। উনি নিজেই তো দেখে গেছেন।'

'ফ্যামিলির মান-সম্মানের প্রশ্ন, সৌম্য। তেমন কিছু ঘটলে দাদা রেগে যাবেন।'

'ঘটবে না। নীতা সোম সুপারস্টার নয়।'

সুদক্ষিণা একটু ইতস্তত করার পর খুব আস্তে বললেন, 'তুই যে ফিল্ম-ম্যাগাজিনটা এনে দাদাকে দিয়েছিস, ওতে নীতা সোমের ছবি আছে।

কিছুক্ষণ আগে দাদা বলছিলেন, মেয়েটিকে চেনা লাগছে। খুলে কিছু বললেন না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, দাদা ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছেন। সবসময় হাসিখুশি মানুষ। হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেছেন।'

'আমি দেখছি।' বলে সৌম্য বেরিয়ে গেল....

॥ তিন ॥

দোতলায় পুবের বারান্দায় হুইলচেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন বারীন্দ্রনাথ। জনি তাঁর বাঁ পাশে পেছনের দুই ঠ্যাং মুড়ে বসে ছিল। তার গলার চেন রেলিঙের থামে বাঁধা আছে। সামনে পোর্টিকোর চৌকো খোলা ছাদ। পাইনগাছটা খুব ঝাঁপালো হয়ে সেই ছাদকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। রাতে হাওয়া দিলে পাইন

কাঁটাগুলো কানিশ আর রেলিঙে ঘষা খেয়ে অদ্ভুত শব্দ করে।

জনি ঘুরে তাকিয়ে গরগর করল। সৌম্য এসে বলল, 'মর্নিং মামাবাবু।'

বারীন্দ্রনাথের ডানপাশে বেতের টেবিল আর একটা চেয়ার। সৌম্য চেয়ারে বসে আবার বলল, 'হাই জনি। মর্নিং। 'জনি তার কাছে আসার চেষ্টা করছিল। সৌম্য তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল।

বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। 'হঠাৎ খুব স্মার্ট হয়ে উঠেছ। কোনও মতলব আছে সম্ভবত। পটে গরম লিকার আছে। রুক্মিণীকে ডেকে একটা কাপ আনিয়ে নাও। রোয়িংয়ের পর মন্দ লাগবে না।'

'আপনি লক্ষ্য রেখেছিলেন?'

'হুঁউ। ও ছেলেটি কে?'

'অরিত্র সেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'অ্যাকটিং করে বুঝি?'

'করে। তবে থিয়েটারেই বেশি ঝোঁক।'

বারীন্দ্রনাথ একটু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রুক্মিণী! একটা কাপ দিয়ে যা তো তোর ছোটাসাবকে।

রুক্মিণী পিছনে তাঁর ঘরের মেঝে মুছছিল। 'জি বড়াসাব!' বলে দ্রুত ভেতরে উধাও হয়ে গেল।

সৌম্য টেবিলে রাখা বাংলা ফিল্মম্যাগাজিনটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, আপনি নাকি নীতা সোমের ছবি দেখে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন?'

'তোমার মায়ের ধারণা সবসময় ঠিক হয় না তুমি জানো!'

'মা বলল নীতা সোমকে আপনার চেনা মনে হয়েছে?'

বারীন্দ্রনাথ একটু কেসে নিয়ে বললেন, 'আমি অ্যানাটমি বিশারদ নই। নৃতাত্ত্বিকও নই। তবে আমার ধারণা, পৃথিবীর সব মানুষকে চেহারার দিক থেকে লক্ষ্য করলে কতকগুলো—আমি জানি না সংখ্যাটা কত দাঁড়াতে পারে, হ্যাঁ—এভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এজন্যই হঠাৎ অচেনা কাকেও দেখলে চেনা লাগে। সে তুমি মুখের চেহারা বলো, শারীরিক গড়ন বলো, কিংবা হাঁটাচলার ভঙ্গি বলো—হ্যাঁ, একটা ক্ল্যাসিফিকেশন করা যায়।'

সৌম্য হাসল। 'অসাধারণ। আপনার এই থিওরির সঙ্গে আমি একমত।'

রুক্মিণী একটা কাপ-প্লেট রেখে গেল। সৌম্য একটু লিকার ঢেলে চিনি মেশাল। বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'কক্ষণো খালি পেটে চা খাবে না। ওই তো

বিস্কুট আছে।'

'আপনার অনারে চা-বিস্কুট খাচ্ছি। আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'বাহ্। ভালো করেছ। আমিও আজকাল দুবেলা দুকাপ—আগে তো যত চা তত সিগারেট।' বারীন্দ্রনাথ সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন। লাইটারে ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং তৈরি করতে থাকলেন।

'সিগারেট কিন্তু কমাতে পারেননি।'

'অনেক কমিয়েছি। তবে টেনসনের সময় একটু বেশি হয়ে যায়।'

'এখন কি কোনও টেনসন আছে? অবশ্য অ্যাশট্রে বলে দিচ্ছে আছে। অথচ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, নেই। অ্যাজ ইট্ ইজ জলি মুড।'

বারীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন—'হ্যাঁ, মুড ফিরে এসেছে। কিন্তু তুমি ঠিকই ধরেছ। এরপর চারটে সিগারেট খেয়েছিলাম। তোমাদের হিরোইনের ছবিটা দেখার পর কিছুক্ষণের জন্য এক্সাইটেড হয়ে উঠেছিলাম। পরে মনে হল আমার ভুল হচ্ছে। যাই হোক, বলো। তুমি কি রোলে থাকছ? হিরো, না—ভিলেন?'

'এ ছবিতে হিরো-ভিলেনের ব্যাপার নেই। অবিনাশদা রিয়্যাল লাইফ্ থেকে ক্যারেক্টার বেছে নেন। হয়তো দেখবেন আপনিও এ ছবিতে একটা ক্যারেক্টার।

'আপত্তি নেই।'

'আমি কিন্তু খুব রিস্ক নিয়ে কথাটা বলেছি মামাবাবু। ভেবেছিলাম আপনি ভীষণ রিঅ্যাক্ট করবেন।'

বারীন্দ্রনাথ সৌম্যের কথায় কান দিলেন না। বললেন, 'ডাইরেক্টর হিরোইনকে নিয়ে কখন এসে পৌঁছুবেন?'

'বলেছেন সকাল আটটায় স্টার্ট করবেন। ঘণ্টা তিনেক তো লাগবেই। সৌম্য একটু ইতস্তত করে ফের বলল, 'মামাবাবু। অরিত্র আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। এখন সময় হবে?'

'তোমার অনারে সময় দেব। তবে জনিকে দূরে কোথাও বেঁধে রাখতে হবে। বাইরের লোক দেখলে হৈচৈ করবে। নাহ্। তুমি ওকে সামলাতে পারবে না। রুক্মিণীকে বলছি।'

সৌম্য চলে গেল। বারীন্দ্রনাথ রুক্মিণীকে ডেকে কুকুরটা সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর পত্রিকাটা তুলে নীতা সোমের ছবির পাতাটা খুঁজে বের

করলেন। ছবিটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন বারীন্দ্রনাথ।

একটু পরে পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন। খাম থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে মিলিয়ে দেখলেন। আবার উত্তেজনাটা ফিরে এল।

নীচের সুরকি-বিছানো রাস্তায় একটু দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সৌম্য ও অরিত্রকে আসতে দেখে বারীন্দ্রনাথ খামটা পকেটে ঢোকালেন। পত্রিকাটা রেখে দিলেন টেবিলে। তারপর ডাকলেন, 'রুক্মিণী'!

রুক্মিণী দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এল।

'চায়ের ট্রে নিয়ে যা। আর শোন। তোর বরকে বলবি, ওই ডালগুলো ছাঁটতে হবে। এখন নয়। পরে।'

সৌম্য অরিত্রকে নিয়ে উত্তরের বারান্দা হয়ে এল। 'মামাবাবু। এই সেই অরিত্র।'

অরিত্র পায়ে প্রণাম করতে এল। বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। 'পা নেই। এক-জোড়া নকল পা। প্রণাম করবে কোথায়? বসো। সৌম্য! আমার ঘর থেকে চেয়ার এনে বস।'

সৌম্য বলল, 'মা আমাকে বসতে বারণ করেছে। দ্বারিককে গাড়িতে বইতে হবে। হররিবল। আমার মারুতির শ্যাসি ভেঙে পড়লেই গেছি।'

'ওসব পলকা গাড়ি কিনেছ কেন?'

'দ্বারিকের জন্য নিশ্চয় কিনিনি।'

বারীন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখে বললেন, 'চণ্ডীতলা বাজারে যাচ্ছ—সাবধান। দ্বারিক যেন কাকেও শুটিংয়ের খবর দেয় না। আমার বলা আছে। তবু—

'মামাবাবু। কোনও কোনও ব্যাপারে মা আপনার চেয়ে ইনটেলিজেন্ট। আমাকে দ্বারিকের এসকর্ট সার্ভিসের দায়িত্ব কেন দিচ্ছে, অলরেডি বুঝিয়ে বলেছে।'

সৌম্য চলে যাওয়ার পর অরিত্র বলল, 'খবর রটে যেতে দেরি হয় না। তবে আমার ধারণা, শুটিং বলতে ঠিক যা বোঝায়, তেমন কিছু হবে না।'

বারীন্দ্রনাথ তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন। 'কী হবে?'

অরিত্র হাসল। 'অবিনাশদার শো বিজনেস। আমাদের সঙ্গে রমেশ ভার্মা নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন। ওয়েস্টার্ন ফিল্ম মার্কেটের ব্রোকার বলতে পারেন ওঁকে। অবিনাশদাকে ডিসটার্ব করবেন। আই মিন, একটা লিস্ট ধরিয়ে দেবেন হাতে। এটা করুন, ওটা করবেন না—আই নো হিম ওয়েল।'

'তাহলে আপনাদের ডাইরেক্টর ওঁকে সঙ্গে রাখছেন কেন ?'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। মনে হচ্ছে, ভার্মাসায়েব নিজেই ইনসিস্ট করে থাকবেন।' অরিত্র হঠাৎ পাইন গাছটার দিকে আঙুল তুলল। 'কী আশ্চর্য ! এটা পাইনগাছ না ?'

'হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদার অদ্ভুত অদ্ভুত হবি ছিল। এবাড়িতে অনেক বিদেশি গাছ দেখতে পাবে। তিনি হাতুড়ে বটানিস্ট ছিলেন। তুমি চা খাবে ?'

'আজ্ঞে না। চা আমি খাই না। ধন্যবাদ।'

'তুমি কি অন্য কিছু করো ? নাকি শুধু অ্যাকটিং ?'

অরিত্র হাসল। 'আমি চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।' একটা ফার্মে চাকরি করি।'

'বাহ্। খুব ভালো।'

'আপনার সঙ্গে আলাপের ভীষণ ইচ্ছে ছিল। কাল রাত্রে আমাদের টিমের ম্যানেজার বটুকদা বলছিলেন, সাংঘাতিক একটা প্লেন অ্যাকসিডেন্টের পর আপনি বেঁচে যান। খুব থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স—'

বারীন্দ্রনাথ তার কথার ওপর বললেন, 'বটুকদা বললে। ওঁর পুরো নাম কী ?'

'বটুক দত্ত।'

'ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। উনি কী করে জানলেন ?'

'সম্ভবত অবিনাশদা কিংবা সৌম্যের মুখে শুনে থাকবেন।' অরিত্র একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'ডিটেলস আপনার মুখে জানতে ইচ্ছে করছে।,

'কাগজে তো বেরিয়েছিল। টিভি-তেও নাকি দেখিয়েছিল—পরে শুনেছি।'

'পড়ে থাকব। মনে নেই। কিংবা অত লক্ষ্য করিনি।' অরিত্র একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি ইনসিস্ট করছি না। আপত্তি থাকলে বলবেন না। আসলে আমি নিজে একবার সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট থেকে দৈবাৎ বেঁচে যাই। সৌম্য বলছিল আপনার ইনসটিংকট কাজ করেছিল। আই বিলিভ দ্যাট।'

'কী অ্যাকসিডেন্ট ?'

'তখন আমি ছাত্র। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ফুটপাতে একটা ঝুলবারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ মাথার ওপর ছাদটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, ধসে পড়বে না তো ? জাস্ট টু অর থ্রি সেকেণ্ডস। পাশেই একটা রেস্তোরাঁর দরজায় সরে গেছি, ছাদটা সত্যি ভেঙে পড়ল। যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা কেউ বাঁচেনি। কয়েকজন পরে হসপিটালে গিয়ে মারা যায়। সেই থেকে একটা আতঙ্ক আমার পিছু ছাড়েনি। পুরনো কোনও বাড়ি দেখলেই একটা স্ট্রেঞ্জ

ফিলিংস হয়।'

বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। 'এই বাড়িটা নাইনটিন টুয়েলভে তৈরি।'

'নাহ্। আমি ঠিক তা বলছি না। ইনসটিংকটের কথা বলছি। সিক্সথ সেন্স বললে পয়েন্টটা হয়তো স্পষ্ট হয়। আমার ধারণা, একসময় প্যারাসাইকোলজি নিয়ে খুব পড়াশুনা করেছিলাম। এখনও তেমন বইটই পেলে পড়ি। ই এস পি বলে একটা টার্ম আছে শুনে থাকবেন। এক্সট্রাসেনসরিয়ারি পার্ফেকশন। এ নিয়ে ওয়েস্টে প্রচুর রিসার্চ হয়েছে। হচ্ছে।'

বারীন্দ্রনাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে অভ্যাস মতো ধোঁয়ার রিং বানাতে থাকলেন। তারপর বললেন, 'সিক্সথ সেন্স কিনা জানি না। পাইলট জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাফ ওয়েদার। ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং ছাড়া উপায় নেই। আমার সিটের পাশেই এমার্জেন্সি ডোর ছিল। প্লেনটা তখন বরফে ঢাকা গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে বিশ পঁচিশ ফুট উঁচুতে। শোনামাত্র এমার্জেন্সি ডোর খুলে ঝাঁপ দিলাম। নরম বরফের স্তর। তেমন কিছু আঘাত লাগেনি।'

'তাহলে আপনার পা—'

'ফর্স্ট বাইট। প্রায় দুমাইল হেঁটে—ঠিক হাঁটা নয়, ওটা ছিল একটা অসমতল উপত্যকা। তবে ঝড়টার গতি যে দিকে, সেইদিকেই যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তারপর একটা রাস্তা পেয়ে যাই। সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফেরে হসপিটালে।'

'প্লেনটা?'

'একবার ঘুরে দেখেছিলাম। আগুন জ্বলছিল।'

'আর একজনও বাঁচেনি?'

বারীন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আমার পাশের সিটে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন।'

'তাঁর কী হল?'

'আমি সব উঠে দাঁড়িয়েছি, কাছেই ওঁর চিৎকার শুনলাম। দেখলাম একটা উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ছেন। সেখানে কয়েকটা পাইনগাছ ছিল। এজাতের পাইন নয়। ক্রিসমাসট্রির মতো দেখতে। ওঁর কাছে যাওয়ার আগেই উনি গড়াতে গড়াতে আমার কাছে এসে হাজির।' বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। 'ব্লিজার্ড,—তুষারঝড় হলে বাঁচার কোনও চান্স ছিল না। যাইহোক, একজন সঙ্গী থাকলে ওই অবস্থায় মনোবল বাড়ে। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য! কিছুক্ষণ হাত

ধরাধরি করে হাঁটার পর—হ্যাঁ, উনিই আমার হাত ছাড়তে চাইছিলেন না। ভীষণ আতঙ্কে যা হয়। তো আমার ডান হাত ব্যথা করছিল। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ রেখে চিৎকার করে বললাম, আমার হাতে আঘাত লেগেছে। হাতটা ছাড়ুন। উনি ছাড়লেন না। অগত্যা জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম। আর সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোক তুষারখাদে তলিয়ে গেলেন। নাহ্। আমি ওঁকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারিনি, কিংবা জানতাম না পাশেই তুষারখাদ আছে। খাদগুলো নরম বরফে ঢাকা থাকে। দেখে বোঝা যায় না কিছু। আমি কেন কোনও খাদে যে তলিয়ে যাইনি, তার ব্যাখ্যা দিতে পারব না।'

'তখন সময় কত ? আই মিন, ডে অর নাইট ?'

'ভোরবেলা। নাইন্থ নভেম্বর।'

'ইতালির কোন এরিয়া ওটা ?'

'তুসচানি এরিয়া। ইংরেজরা বলে টাসক্যানি। পাহাড়ি এলাকা। রাফ ওয়েদারের জন্য আমাদের প্লেনটা পথ বদলেছিল। যেখানে ক্র্যাশল্যাণ্ডিং করেছিল, সেই জায়গাটার নাম লা মারেম্মা। ওখানকার পাইনের জঙ্গল বিখ্যাত। পরে জেনেছিলাম।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? মাস তিনেক ফ্লোরেন্সে একটা হসপিট্যালে থাকার পর ভারত সরকার আমাকে বোম্বেতে এনেছিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি একজন এক্স এম পি।' বারীন্দ্রনাথের ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'আমাদের সরকারের একটা প্রেসটিজ বলে কথা। ফ্লোরেন্সে ডাক্তাররা আমাকে বলেছিলেন, পা ফিরে পাব। বোম্বের ডাক্তাররা বললেন, হাঁটুর নীচে থেকে বাদ না দিলে উরুও নষ্ট হয়ে যাবে। যাক গে। আপদ গেল।' বারীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন।

'সেই ভদ্রলোকের পরিচয় জানা যায়নি ?'

'বাঙালি।'

অরিত্র নড়ে বসল। 'বাঙালি ? কী নাম ছিল ভদ্রলোকের ?'

'এস কে রায়। ব্যবসা ট্যাবসা করতেন—যতদূর মনে পড়ছে। কলকাতার লোক।' বারীন্দ্রনাথ দূরের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, 'তদন্ত হয়েছিল। আমি সত্যি যা ঘটেছিল, তাই বলেছিলাম।'

'ওর ফ্যামিলির মোটা টাকা কম্পেনসেশন পাওয়ার কথা। তাই না ?'

'জানি না। আমার পা দুটো ঠিক থাকলে খোঁজ নিতাম। তবে কম্পেনসেশন—তুমি ঠিক বলেছ, পাওয়ারই কথা। ফ্যামিলি থাকলে নিশ্চয় পেয়েছিল। না থাকলে অন্য কথা।'

সুদক্ষিণা এসে বললেন, 'তোমার ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে।'

অরিত্র উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সরি মাসিমা।'

সুদক্ষিণা বললেন, 'না, না—তুমি বসো। সৌম্য বলে গেছে। তোমাকে যেন না খাইয়ে ছাড়ি না।'

'না মাসিমা। বটুকদা রাগ করবেন। তা ছাড়া আমাদের টিমের একটা ডিসিপ্লিন আছে। মামাবাবু! চলি!'

অরিত্র বারীন্দ্রনাথের সামনে প্রণামের ভঙ্গিতে নত হল। তারপর সুদক্ষিণার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'একে সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দাও। রুক্মিণী কোথায় জনিকে বেঁধে রেখেছে জানি না। আর শোনো। রুক্মিণীকে বল, এবার জনিকে নিয়ে আসুক। আমরা দুই বন্ধু এখানেই ব্রেকফাস্টে বসতে চাই।'

সুদক্ষিণা অরিত্রকে পৌঁছে দিতে গেলেন। বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারের তালা খুলে পকেটে রাখা ছবির খামটা ড্রয়ারে ঢোকালেন। তালা এঁটে বেরিয়ে এলেন।

একটু পরে রুক্মিণী জনিকে নিয়ে এল। আগের জায়গায় বেঁধে রাখল। বারীন্দ্রনাথ নীচের রাস্তাটা দেখছিলেন। অরিত্র যেতে যেতে বার দুয়েক পিছু ফিরে তাঁকে দেখে গেল। হঠাৎ মনে হল, সৌম্যের বন্ধু প্লেনক্র্যাশের ঘটনা সম্পর্কে যেন একটু বেশি আগ্রহী। সিক্সথ সেন্স, প্যারাসাইকোলজি, ই এস পি এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া—

কিন্তু তার মুখের হাবভাব এবং চোখের দৃষ্টিতে যেন এসবের অতিরিক্ত কিছু ছিল।

নাকি বারীন্দ্রনাথের নিজেরই দেখার ভুল? আগে কেউ সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলে খুব রঙ চড়িয়ে বলতেন। ক্রমশ একই কথা আর বলতে ভাল লাগে না। মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে থেমে যান। যে শুনছে, সে হয়তো তাঁর প্রতি সমবেদনা দেখানোর জন্যই আগ্রহ দেখায়।

তবু একটা খটকা থেকে গেল।....

বেলা একটা নাগাদ বারীন্দ্রনাথ বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন, সেই সময় সুদক্ষিণা এসে ঘোষণা করলেন, 'এতক্ষণে ওরা এল। সৌম্য দেরি দেখে.

অস্থির। পাগলামির একটা সীমা থাকা উচিত। স্নান খাওয়া নেই। গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল।'

বারীন্দ্রনাথ বই রেখে বললেন, 'সেই মেয়েটি—নীতা সোমকে দেখলে?'

'হ্যাঁ। মোটামুটি ভদ্র বলেই মনে হল। খুব ডাঁট দেখাবে ভেবেছিলাম।' তেমন কিছু নয়। ওর সঙ্গে আরও একটি মেয়ে এসেছে। নীতার বন্ধু। ফিল্ম জার্নালিস্ট। বড্ড বেশি গায়ে পড়া। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে বলল। আমি বললাম দাদাকে জিজ্ঞেস করব। সৌম্য বলে দিল, জিজ্ঞেস করার কী আছে? সৌম্যের আদিখ্যেতা দেখে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।'

বারীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, 'আমার রাগ হচ্ছে না। তবে আগে আমি নীতা সোমের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। সৌম্যকে পাঠিয়ে দিও।'....

।। চার ।।

বিকেলে সহসা প্রাকৃতিক উপদ্রব। তুমুল বৃষ্টি এবং মেঘের গর্জন। সেই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে আসা এলোমেলো হাওয়া। শুটিংয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। পণ্ড হয়ে গেল।

শরৎকালে এ উপদ্রব অপ্রত্যাশিত ছিল না। ক'দিন থেকে গুমোট গরম পড়েছিল। নিসর্গ ছিল পটে আঁকা ছবির মতো স্থির। এখন চারদিকে জোরালো আলোড়ন। চোখধাঁধানো বিদ্যুতের মুহুর্মুহু চাবুক।

বারীন্দ্রনাথ ফিল্মের লোকেদের সভয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখে মনে মনে হাসছিলেন। একসময় টের পেলেন বৃষ্টির ছাঁট এসে তাঁকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। পাইনের ডালগুলো ছেঁটে ফেলা ঠিক হয়নি। আসলে আউটহাউসের পুরোটা যাতে চোখে পড়ে, সেইজন্য বাবুরামকে কতকগুলো ডাল দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাবুরাম এ বাড়ির পুরনো মালী। এসব কাজ সে শিল্পীর দক্ষতায় করতে পারে। পাইনগাছটার দিকে তাকালে এখন বরং ছিমছাম লাগে।

জনি মেঘ ডাকলে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। রুক্মিণী তাকে পাশের ঘরে রেখে এসেছে। ও ঘরে কিছু পুরনো আসবাব আছে। দুটো আলমারি আর একটা আয়রন চেস্ট আছে। জনির মন্দ লাগবে না।

বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে তাঁর শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে সরে এলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। সৌম্য বলে গিয়েছিল, চারটেয় নীতা সোম

আসবে। এদিন সে নাকি খুব ক্লান্ত। শুাটিংয়ের মেজাজ নেই। চারটে বাজতে দু মিনিট বাকি। এখনই ঘরের ভেতর আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। বারীন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'রুক্মিণী!'

রুক্মিণী দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। 'জি বড়াসাব' বলে ছুটে এল।

বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'আলো জেলে দে।'

রুক্মিণী তাঁর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে বলল, 'কারেন্ট বন্ধ আছে বড়াসাব!'

বারীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, 'ট্রান্সফর্মারে বাজ পড়ে গেল নাকি ছাখ। সিনেমার বাবুরা আজ রাতে ঝিলের ডাইনির পাল্লায় পড়বে। কী বলিস?

রুক্মিণী হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'চিনাবাত্তি জেলে দিই বড়াসাব। মাচিস কোথায় রাখলেন?'

'নিয়ে আয়। আমি লাইটারে জেলে দিই। আমার কাছে দেশলাই নেই।'

চিনা লণ্ঠন টেবিলে রেখে রুক্মিণী বলল, 'চা আনব বড়াসাব?'

'পুরো একপট চা নিয়ে আয়। দুটো কাপপ্লেট আনিস। কেমন?'

রুক্মিণী চলে গেল। প্রতীক্ষা একটা দুঃসহ ঘটনা মানুষের জীবনে। সৌম্য কি ডাইরেক্টর ভদ্রলোকের সঙ্গে আউটহাউসে চলে গেছে? বৃষ্টি সমানে ঝরছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল ক্রমশ।

সুদক্ষিণা দক্ষিণের বারান্দা ঘুরে এলেন। তাঁর সঙ্গে দুই যুবতী। সুদক্ষিণা বললেন, 'কারেন্ট নেই। হঠাৎ কি বিচ্ছিরি উৎপাত। আমি বললাম, ওপরে চলো বরং। দাদা আলাপ করতে চেয়েছেন।'

বারীন্দ্রনাথ নীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি নীতা সোম?'

নীতা একটু ঝুঁকে করজোড়ে নমস্কার করল। তার পরনে শাড়ি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। সিনেমার নায়িকাদের আদল তার মুখে।

বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'বসো। বাইরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে।'

নীতা শান্তভাবে বসল। রাত্রির পরনে সালোয়ার কামিজ। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাঠের পা প্রণাম নেয় না। বসো। তোমার নাম কী?'

'রাত্রি সেন।'

'বাহ্। অসাধারণ নাম। তুমি ফিল্ম জার্নালিস্ট? কোন কাগজের?'

'আমি ফ্রি ল্যান্সার।'

সকালে একটি ছেলে আলাপ করতে এসেছিল। অরিত্র সেন। বাই এনি চান্স, তোমাদের দুই সেনের মধ্যে কোনও আত্মীয়তা আছে কি?'

রাত্রি মাথা নাড়ল। 'নাহ। অরিত্র থিয়েটারে অভিনয় করে। সেই সূত্রে চেনা-জানা আছে।

'পুপু। রুক্মিণীকে চা আনতে বলেছি। তুমি গিয়ে দেখ। আরও একটা কাপপ্লেট পাঠিয়ে দিও। আর দ্বারিককে হলঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বলো।'

রাত্রি বলল, 'মাসিমা। আমি কিন্তু চা খাই না। নীতা। তুমি তো খাও।'

নীতা বারীন্দ্রনাথকে দেখছিল। কোনও কথা বলল না। সুদক্ষিণা চলে গেলেন। বারীন্দ্রনাথ রাত্রির দিকে ঘুরে বললেন, 'রাত্রি। আমার মনে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক আছে।'

রাত্রি হাসল। 'আছে। আমি ওকে এক্সপ্লয়েট করি। তবে ওরও পাবলিসিটি হয়।'

বারীন্দ্রনাথ সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে আস্তে বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি নীতার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলব। প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল।'

'বলুন না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।' রাত্রি নীতার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'বারান্দায় দাঁড়ালে ভিজে যাবে। বরং তুমি নীচে আমার বোনের সঙ্গে গল্প করতে পারো।' বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। 'শি টক্স মাচ। তো তুমি জার্নালিস্ট। ইউ লাইক টক্স।'

'আমি ফিল্ম জার্নালিস্ট।'

'হুঁ। যে পরিবেশে এই ফিল্ম তোলা হচ্ছে, সে বিষয়ে ডিটেলস জানতে পারবে। এবাড়ির একটা ইতিহাস আছে। তা ছাড়া উত্তরের ওই ঝিলটার নাম ডাইনির ঝিল। ইন্টারেস্টিং না?'

রাত্রি হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বেরিয়ে গেল। উত্তরের বারান্দার দিকে এগোতে গিয়ে ঘুরল দক্ষিণের বারান্দায়। তিনটে ঘরের পর হলঘরে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি। সে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সুদক্ষিণা তাকে

দেখতে পেয়ে নীচে ডাকলেন। হলঘরে টেবিলের ওপর একটা চিনা লণ্ঠন জলছে। অনিচ্ছার সঙ্গে রাত্রি নেমে গেল। বলল—'মাসিমা। আপনারা এমার্জেন্সি লাইট রাখেন না কেন? চার্জ দিয়ে রাখলেই তো লোডশেডিংয়ের সময় প্রচুর আলো পান।'

সুদক্ষিণা বললেন, 'যতগুলো সৌম্য এনে দেয়, বেশিদিন টেঁকে না। দাদা কি নীতার সঙ্গে একা আলাপ করতে চাইলেন?'

'হ্যাঁ। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'দাদার ওই এক বেয়াড়া স্বভাব। দেখবে, তোমার সঙ্গেও একা আলাপ করতে চাইবেন। ও কিছু না।'

নীতা সোম আস্তে বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার প্রাইভেট অ্যাণ্ড কন্‌ফিডেনসিয়াল কী কথা থাকতে পারে? আমি আপনাকে কখনও দেখিনি। চিনি না।'

'তোমাকে একটা ছবি দেখাব।' বলে পকেট থেকে চাবি বের করলেন বারীন্দ্রনাথ। পাশের টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। তারপর একটা খাম থেকে ছবি বের করে বললেন, 'দেখ তো, চিনতে পারো কি না?'

নীতা ছবির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠল সে। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কেন এ ছবি দেখাচ্ছেন আমাকে?'

'এই ভদ্রলোকের নাম এস কে রায়। ভদ্রমহিলা তাঁর স্ত্রী। মাঝখানে তাঁদের মেয়ে—তোমার সঙ্গে আশ্চর্য মিল। এমন কি চিবুকের তিলটাও।'

নীতা চুপ করে থাকল। রুক্মিণী এসে চা রেখে গেল। বারীন্দ্রনাথ চা তৈরি করে তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর নিজের চা তৈরি করে চুমুক দিলেন। বললেন, 'দু বছর আগে ইতালির লা মারেম্মা পাইন উডসের মধ্যে একটা প্লেন ক্র্যাশল্যাণ্ডিং করেছিল। আমি সেই প্লেনের যাত্রী ছিলাম। আমার পাশের সিটে ছিলেন এস. কে রায়। এমার্জেন্সি ডোর খুলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি। মিঃ রায়ও আমার সঙ্গে ঝাঁপ দেন। তাঁর দুর্ভাগ্য। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। হঠাৎ উনি তুষারখাদে তলিয়ে যান। যাওয়ার মুহূর্তে আমার ডান হাতে ওঁর ব্রিফকেসটা থেকে যায়। ফ্লোরেন্সের একটা হসপিট্যালে সুস্থ হয়ে ওঠার পর ব্রিফকেসটা আমি খুলেছিলাম। হ্যাঁ—ইট ওয়াজ লকড। আমি নার্সদের বলে একজন লক-মেকানিকের সাহায্য নিয়েছিলাম।'

নীতা ঠোঁট কামড়ে ধরে শুনছিল। বলল, 'কী ছিল ওতে?'

'কিছু জামাকাপড়। অনেকগুলো! নেমকার্ড। কয়েকটা চিঠি। ছ মাস পরে এই অবস্থায় কলকাতায় ফিরলাম। তারপর লোক পাঠিয়ে মিঃ রায়ের ঠিকানায় খোঁজ নিলাম। শুনলাম মিঃ রায়ের স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। প্লেন কোম্পানির অফিসে যোগাযোগ করেছিলাম। আমি একজন এক্স এম পি। আমার বাবা মন্ত্রী ছিলেন। আই হ্যাড সো মেনি কনট্যাক্টস্, ইউ নো? তো ওঁরা জানালেন, মিসেস রায় সত্তর হাজার টাকা কম্পেনসেশন পেয়েছেন। আমি সব নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। দুটো রেসপন্স পেয়েছিলাম। দুটোই জাল। পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মিসেস রায়ের ছবির সঙ্গে মেলেনি।'

নীতা চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি নীচের দিকে।

বারীন্দ্রনাথ গম্ভীরমুখে বললেন, 'মিঃ রায় ছিলেন বিজনেসম্যান। তবে একই সঙ্গে অকশনিয়ারের কারবারও করতেন। ওঁর কাগজপত্র থেকে একথা জেনেছি। দামি জিনিস বিশেষ করে পুরনো ঐতিহাসিক জিনিস নিলামে কিনে অন্য দেশে নিলামে বেচতেন। ওঁর স্ত্রীর নাম তপতী রায়। মেয়ের নাম ঊর্মি।'

নীতা চাপা শ্বাস ছেড়ে মাথা দোলাল। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কিছু। গতরাতে কেউ আমার প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করে থ্রেটন করেছিল, এখানে এলে নাকি আমার বিপদ হবে। এখন আপনি এসব কথা বলছেন। আমার অস্বস্তি হচ্ছে। প্লিজ স্টপ ইট'।

বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি চা খাচ্ছ না!'

'ইচ্ছে করছে না।'

বারীন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'লা মারেস্মা পাইন উডস ভ্যালিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ডান হাতে আঘাত লেগেছিল। মিঃ রায় আমার এই হাতটা আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমি জোর করে ছাড়িয়ে না নিলে হয়তো—হ্যাঁ। এই অপরাধবোধ আমার মধ্যে থেকে গেছে। তাই ওঁর ব্রিফকেস ওঁর স্ত্রী বা মেয়ের হাতে তুলে দিতে চাই। অ্যাণ্ড আই থিংক, আই অ্যাম নট টকিং টু দ্য রং পার্সন।'

নীতা একবার তাকিয়েই চোখ নামাল।

বারীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, সৌম্য বলে, আমার নাকি সিক্সথ সেন্স আছে। সৌম্য কাল বিকেলে আমাকে এই ফিল্ম ম্যাগাজিনটা দিয়েছিল। এতে তোমার ছবি আছে। এনিওয়ে। তুমি এইমাত্র বললে, গতরাতে কে তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করে হুমকি দিয়েছে। কাজেই হ্যাঁ—তুমি ঊর্মি। এক

মিনিট। তোমাকে ব্রিফকেসটা এনে দেখাচ্ছি।'

নীতা ভাঙা গলায় বলল, 'প্লিজ। দ্য পাস্ট ইজ পাস্ট। আই ওয়াণ্ট টু ফরগেট দ্যাট্ ন্যাস্টি টাইম।'

'ব্রিফকেসটা এখন তোমাকে দেব না। কারণ তোমার বাবা একটা খুব দামি জিনিস লণ্ডনের অক্‌শন হাউসের মাধ্যমে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা ওতে আছে। যাইহোক তোমার মা কোথায় আছেন ?'

'আমি নিজের মুখে বলতে পারব না। দ্যাট্‌স এ স্ক্যাণ্ডালাস অ্যাফেয়ার।'

'উর্মি। এ খুব গোপনীয় ব্যাপার। তোমার প্রাণের ঝুঁকি আছে তা বুঝতে পেরেছি। এর মধ্যে কোনও থার্ড পার্সনকে টেনে আনা ঠিক নয়।' বারীন্দ্রনাথ চাপা গলায় বললেন ফের, 'তোমার বন্ধুকে কিছু বোলো না।'

নীতা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'শি ইজ এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'বলো কী', বারীন্দ্রনাথ হাসলেন। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এটা তোমার কোনও সিনেমার গল্প না। রূঢ় বাস্তব।'

'রাত্রির একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। ব্ল্যাক ক্যাট এসকর্ট সার্ভিস।' নীতা চোখের জল মুছে ফের বলল, 'দ্য সন অব এ বিচ—যে লোকটা আমার মাকে এলোপ করেছিল, অ্যাণ্ড দ্যা ফুলিশ উওম্যান হ্যাড টু কমিট সুইসাইড— [redacted] রাত্রি তাকে ফিনিশ করেছে।'

'ফিনিশ ? হোয়াট ডাজ দ্যাট্ মিন ?' [redacted]

'শি ইজ ডেঞ্জারাস।'

বারীন্দ্রনাথ দরজার দিকে ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে বললেন, 'দেন ইউ মাস্ট অ্যাভয়েড হার।'

রাত্রির কাছে আমার কিছু গোপন থাকে না।'

'এটা তোমাকে গোপন রাখতেই হবে, উর্মি।'

'প্লিজ ডোণ্ট কল মি উর্মি। শি ইজ ডেড।'

'ঠিক আছে।' বারীন্দ্রনাথ চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বাট আই ইনসিস্ট, ওকে ব্রিফকেসের কথা বোলো না।'

'গতরাতে আমাকে থ্রেটস করার কথা রাত্রিকে তখনই জানিয়েছিলাম। তারপর সে আমার সঙ্গে এসেছে। রিস্ক নিয়েও এসেছে। নাও ইউ থিংক।'

বারীন্দ্রনাথ সিগারেট অ্যাসট্রেতে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'তুমি কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাম শুনেছ ?'

'না। হু ইজ হি?'

'হি ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান ইওর ডিটেকটিভ ফ্রেণ্ড। তিনিও প্রয়োজনে কাকেও ফিনিশ করেন। তবে নট ইন দ্যাট্ সেন্স। ডোণ্ট ফরগেট নীতা, আমি একজন এক্স এম পি। তুমি আমার কথা শোনো। এ ধরনের প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কথা আমি জানি। ওরা আসলে ভাড়াটে গুণ্ডা পোষে। পুলিস এদের দিকে নজর রেখে চলে। হ্যাঁ—পুলিসকে এরা একটা শেয়ার দেয়। তা ও জানি। অ্যাণ্ড আই মাস্ট টেল ইউ—অরিত্র ইজ ভেরি মাচ ইণ্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য প্লেনক্র্যাশ। রাত্রি আর অরিত্র পরস্পর পরিচিত।'

এইসময় পাশের ঘরে জনির গর্জন শোনা গেল। বারীন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, 'যা শুনেছ, ভুলে যাও। কেউ আসছে—যাকে জনি পছন্দ করে না। তুমি বসো। আমি দেখছি।'

বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে বাইরে গেলেন। তিনি ডাকলেন, দ্বারিক। দ্বারিক।'

রুক্মিণী দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে দৌড়ে এল। 'জি বড়াসাব।'

'দ্বারিক কোথায়?'

'কিচেনে বৈঠে আছে। ঠাকুরমোশায়ের সঙ্গে কথা বলছে।'

'জনিকে নিয়ে আয়। শোন। এ ঘরের ভেতর দিয়ে যা। ও ঘরটা আমি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। গলার চেন ধরে নিয়ে আসবি। দেখিস, আমার ঘরে ফিল্মের মেমসাব বসে আছে। জনির মেজাজের ঠিক থাকে না।'

রুক্মিণী সাবধানে জনিকে নিয়ে এল। জনি নীতাকে দেখল। কিন্তু কিছু বলল না। বারীন্দ্রনাথ রুক্মিণীর কাছ থেকে জনিকে নিলেন। বললেন, 'তুই নীচে গিয়ে দ্বারিককে বল, সিঁড়ির মাথায় হ্যাজাগটা জ্বালিয়ে রাখবে।'

বৃষ্টি টিপটিপ করে ঝরছে। হাওয়াটা থেমে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছমছম করছে নীচের দিকে। আউটহাউসে আলো জ্বলছে। বারীন্দ্রনাথ উত্তরের বারান্দা থেকে দরজার সামনে দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন। তারপর ফিরে এলেন।

জনির গলার চেন ধরে হুইলচেয়ার গড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন বারীন্দ্রনাথ। তারপর টেবিলের একটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। কুকুরটা পিছনের দুই ঠ্যাং মুড়ে জিভ বের করে তাকিয়ে থাকল নীতার দিকে।

বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'জনি লাইকস ইউ।'

নীতা সেই ছবিটা দেখছিল। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। শাড়ির আঁচলে চোখ

মুছে বলল, 'এই ছবিটা আমি নিতে পারি ?'

'এখন নয়। যথাসময়ে এটা তুমি পাবে। ব্রিফকেসটাও পাবে।' বারীন্দ্রনাথ ছবিটা নীতার হাত থেকে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে রাখলেন। তারপর ড্রয়ারে তালা এঁটে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছেন, সেইসময় আউটহাউসের দিকে একটা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা গেল। জনি গরগর করে উঠল। বারীন্দ্রনাথ দ্রুত ওর গলার চেন ধরে না ফেললে টেবিলসুদ্ধ টেনে দরজার দিকে এগিয়ে যেত সে।

নীতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি বসো। আমি দেখছি কী হয়েছে।'

জনির চেন ধরে বারান্দায় গেলেন বারীন্দ্রনাথ। নীচের রাস্তার টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কে দৌড়ে আসছে। বারীন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'দ্বারিক। দ্বারিক।

হলঘরে সিঁড়ির মাথায় হ্যাজাগ জ্বলছে। দ্বারিকের সাড়া পাওয়া গেল নীচে পোর্টিকোর কাছে। তারপর সৌম্যের গলা শোনা গেল। সে দ্বারিককে কিছু বলল। দ্বারিক টর্চ জ্বালতে জ্বালতে আউটহাউসের দিকে দৌড়ুল। জনি সমানে গর্জন করছিল।

একটু পরে সৌম্য দক্ষিণের বারান্দা ঘুরে ছুটে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'মামাবাবু। সাংঘাতিক ব্যাপার। অরিত্রকে কে মার্ডার করেছে।'

'একটু শান্ত হও। তারপর বলো।'

'এ একটা অসম্ভব ব্যাপাব। আমরা মেঝেয় বসে স্ক্রিপ্ট শুনছিলাম। লক্ষ্য করিনি কখন অরিত্র করিডরের দরজা খুলে ঘাটে গেছে। বটুকদা বাইরে থেকে বললেন, ঘাটের দরজা খুলল কে ? আমি অরিত্রকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই মনে হল, রোয়িং করতে গেল নাকি। ও মাই গড ! ঘাটে আলো ফেলে দেখি, অরিত্রের মাথায় চাপ-চাপ রক্ত-উপুড় হয়ে ঘাটের ধাপে পড়ে আছে।'

সুদক্ষিণা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, 'কোথায় খুনোখুনি হয়েছে সৌম্য ?'

নীতা সোম উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভাঙা গলায় বলল, 'রাত্রি কোথায় মাসিমা ?'

'ও তো আউটহাউসের দিকে ছুটে গেল। বারণ করলাম। শুনল না।'

বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'পুপু। তুমি নীচে গিয়ে থাকো। সৌম্য। আমি দেখছি থানার লাইন পাই কি না। না পেলে তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। এক মিনিট।'

ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে একটা টুলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে বারীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, 'টেলিফোন লাইন ডেড। সৌম্য। তুমি থানায় গিয়ে খবর দাও। আর এই টেলিফোন নাম্বারটা নিয়ে যাও। বরং ওঁর নেম-

কার্ডটাই দিচ্ছি। এক্সচেঞ্জের বা থানা যেখান থেকে হোক, এই ভদ্রলোককে ট্রাঙ্ককল করে আমার কথা বলবে। শুধু বলবে, হেয়ার ইজ আ ভেরি মিসটিরিয়াস মার্ডার। যতক্ষণ লাইন না পাও, ওয়েট করবে। তবে আমার নাম করলে শিগগির পেতেও পারো। কুইক।...

॥ পাঁচ ॥

সৌম্য গাড়ি নিয়ে চণ্ডীতলা বাসস্টপে অপেক্ষা করছিল। এক্সপ্রেস বাসটা এল পাঁচ মিনিট দেরিতে। সকাল নটায় পৌঁছুনোর কথা। বারীন্দ্রনাথ চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাই চিনে নিতে দেরি হল না। মাথায় টুপি, সাদা গোঁফ দাড়ি লম্বা-চওড়া মানুষ। গলায় বাইনোকুলার ও ক্যামেরা ঝুলছে। পিঠে আটকানো একটা ব্যাগ। ব্যাগের কোনা দিয়ে ছড়ি বা ছাতার বাঁটের মতো কী একটা উঁচিয়ে আছে। গায়ে ছাইরঙা ফুলহাতা শার্ট। পরনে ব্রিচেসের মতো আঁটো প্যাণ্ট এবং পায়ে হান্টিং বুট। হঠাৎ দেখলে সায়েব ট্যুরিস্ট মনে হয়।

সৌম্য এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল, 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? আমি সৌম্য ব্যানার্জি। বারীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী আমার মামা। কাল রাতে আমি আপনাকে ট্রাঙ্ককল করেছিলাম।'

কর্নেল নিঃসঙ্কোচে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার বাবা অশোক ব্যানার্জিকে আমি চিনতাম। তুমি কী করো?'

'বাবার অ্যাডভার্টিজিং এজেন্সিটা চালিয়ে যাচ্ছি।' সৌম্য গাড়ির দরজা খুলে দিল। 'মামাবাবুর কাছে আপনার পরিচয় পেলাম। আপনি ওঁর বাগানবাড়িতে নাকি অনেকবার এসেছেন। আমি জানতাম না।'

কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন, 'তোমার মা-ও আমার পরিচিত।'

সৌম্য স্টার্ট দিয়ে বলল, 'মা আপনার কথা বলছিল। আপনি নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি খান।'

'এবং চুরুট।' কর্নেল বাইনোকুলার তুলে বললেন, 'চণ্ডীতলার পর থেকে বসন্তপুর পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কিলোমিটার লো ল্যাণ্ড! একসময় প্রায় সবটাই ছিল জলা আর—মার্শল্যাণ্ড। আর কত পাখি।'

সৌম্য বলল, 'জায়গাটা আমার ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ হয়ে গেল।'

'তুমি বলছিলে এ ভেরি মিসাটরিয়াস মার্ডার।'

'হ্যাঁ। অরিত্র সেন নামে আমার এক বন্ধু—'

'গোড়া থেকে বলো। মেক ইট ব্রিফ। আর গাড়ি আস্তে চালাও। আমার পাখি দেখার সুবিধে হবে।'

সৌম্য স্পিড কমাল। তারপর আগাগোড়া ঘটনার বিবরণ দিতে থাকল। কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার। শুনছেন কি না বুঝতে পারছিল না সে।

বাগানবাড়ির প্রায় আধকিলোমিটার দূর থেকে হাইওয়ের চড়াই শুরু হয়েছে। সে থেমে গেলে কর্নেল বললেন, 'পুলিস কি কাকেও অ্যারেস্ট করেছে?'

'অবিনাশদার টিমের ম্যানেজার বটুক দত্তকে ধরে নিয়ে গেছে।' সৌম্য উত্তেজিত ভাবে বলল, 'অ্যাবসার্ড। বটুকদা সন্ধ্যা থেকে ড্রাঙ্ক অবস্থায় থাকেন! পুলিস বলছে, মদ খেয়ে মারামারি। আউটহাউসের করিডরে রান্নার জন্য কিছু কাঠ ছিল। ঘাটের পাশে রক্তমাখা একা কাঠও পড়ে ছিল। কিন্তু বটুকদা জলি টাইপ মানুষ। আসলে উনিই প্রথমে ঘাটের দিকের দরজা খোলা দেখতে পান। পুলিস এই পয়েন্টটাকে গুরুত্ব দিয়েছে।'

'ওঁরা কি এখনও আছেন?'

ভোরে অবিনাশদা আর রমেশ ভার্মা চণ্ডীতলা গেছেন। আমার ধারণা, হায়ার অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি ওঁদের ফিরতে দেখিনি। অবিনাশদার খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। রমেশ ভার্মাও নাকি বিগ গাই—অরিত্র আমাকে বলেছিল।'

'তোমার কী ধারণা?'

'কী ব্যাপারে?'

'অ্যাবাউট দিস ভেরি মিসটিরিয়াস মার্ডার?'

'অপনাকে বলছিলাম। অরিত্র এই শ্যুটিংয়ের ব্যাপারে একটা গোপন কথা আমাকে পরে বলবে বলেছিল।'

'হুঁ। কিন্তু বলার সুযোগ পেল না। ইজ ইট?'

'এখন আমার মনে হচ্ছে, অরিত্র কোনও সাংঘাতিক কথা জানতে পেরেছিল বলেই তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'বাট হু ক্যান ডু দ্যাট, ইউ থিঙ্ক?'

'বুঝতে পারছি না। মে বি, অরিত্র তার মার্ডারারকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য

চুপিচুপি ঘাটে ডেকেছিল। কিংবা তার মার্ডারারই রফা করার ছলে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে তখন কারেন্ট ছিল না। এমার্জেন্সি লাইটের সামনে বসে অবিনাশদা স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন—বটুকদা রাতের রান্নার ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছিলেন। তখন ওঁর ড্রাঙ্ক অবস্থা।'

'এখন কি পুলিস আছে ওখানে ?'

'একজন এস আই এবং জনাচার কনস্টেবল আছে।'

'হুঁ। পুলিসভ্যান দেখতে পাচ্ছি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। পোর্টিকোর পাশে টেলিফোন বক্সের তার কেউ টেনে ছিঁড়ে রেখেছিল। রাতেই অবশ্য জোড়া দিয়েছি।'

'পুলিস দেখেছিল কি ?'

'হ্যাঁ। ও সি নরেশবাবু আমাকে জোড়া দিতে বলেছিলেন। এ থেকে আমার ধারণা, মার্ডারার অরিত্রর বডি কোথাও লুকিয়ে ফেলার জন্য সময় চেয়েছিল। আই মিন, মার্ডারের আগেই এটা করেছিল সে।'

'কেন তা করবে সে ?'

'পুলিস আসতে দেরি হবে। প্রায় ছ কিলোমিটার দূরে--থানায় খবর দিতে যেতে হবে এবং তারপর পুলিস সেখান থেকে আসবে। এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া রাফ ওয়েদার।'

'বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ।'

সৌম্য প্রাইভেট রোডে গাড়ি ঢোকাল। দুধারে গভীর খাদ। জলে শালুক ফুটে আছে। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো এবং কাল বিকেলের বৃষ্টির জল এখনও গর্তে জমে আছে। সৌম্য সাবধানে ড্রাইভ করছিল। ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে বলল, 'আর একটা ব্যাপার। ঘাটে রোয়িং বোটের দড়ির ফাঁস ঢিলে হয়ে ছিল। আমি পুলিসকে বলেছিলাম। ওঁরা বললেন, ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। কাজেই ওটা কিছু নয়। কিন্তু আমি নিজে কাল ভোরে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলাম। আমার ধারণা, অরিত্রের বডি বোটে চাপিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল মার্ডারার। উত্তরে ঘন কাশবন আছে। পরে সময়মতো গিয়ে পুঁতে ফেলা যেত। ওখানে মাটিটা খুব নরম।'

'খোঁড়ার জন্য একটা কোদাল বা কিছু দরকার হত।'

'ঠিক এটাই বলতে চাইছিলাম। বাবুরাম মালীর কাছে উনুন খোঁড়ার জন্য বটুকদার লোকেরা একটা কোদাল চেয়ে নিয়েছিল। আজ ভোরে বাবুরাম বলল,

কোদালটা খুঁজে পাওয়া গেল না।'

রামবাহাদুর ফটক খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল। গাড়ি ভেতরে ঢোকার পর কর্নেল বললেন, 'কাল অবিনাশবাবু যখন আসেন, তখন ওঁর সঙ্গে কারা ছিলেন?'

'হিরোইন নীতা সোম, তার ফিল্মজার্নালিস্ট বন্ধু রাত্রি সেন, ক্যামেরাম্যান শুভময় ঘোষ আর এক ভদ্রলোক—আমি চিনি না। ছবির প্রোডিউসারও হতে পারেন।'

'উত্তরে ঘুরে গাড়ি পুবের পোর্টিকোর তলায় পৌঁছুল। কর্নেল নেমে বাইনোকুলারে আউটহাউসটা দেখে নিয়ে বারান্দায় উঠলেন। সুদক্ষিণা হন্তদন্ত এসে প্রণাম করলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'সৌম্য, তুমি কি জানো তোমার মায়ের নাম পুপু? তো পুপু। আগে কফি।'

সৌম্য কর্নেলকে ওপরে নিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন, 'মর্নিং মিঃ রায়চৌধুরী।'

বারীন্দ্রনাথ দু হাতে ওঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'মর্নিং কর্নেল সরকার। বাধ্য হয়ে আপনাকে কষ্ট দিলাম। তবে আমি জানতাম, আপনি আসবেন। আসুন।'

সৌম্য বলল, 'আমার থাকার কি দরকার আছে মামাবাবু?'

'না। রাত্রি সেন তোমাকে খুঁজছিল। তাকে একটু আগে আউটহাউসের দিকে যেতে দেখলাম।'

সৌম্য চলে গেল। বারীন্দ্রনাথ কর্নেলকে পূবের বারান্দায় তাঁর ঘরের সামনে নিয়ে গেলেন। দক্ষিণের বারান্দা থেকে জনির গরগর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। বারীন্দ্রনাথ বললেন, বারান্দায় বসা যাক। আজ ভোরবেলা থেকে হাওয়া আছে। কদিন যা গুমোট গরম গেল। বসুন।'

কর্নেল পিঠে আটকানো ব্যাগটা খুলে পায়ের কাছে রাখলেন। ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার টেবিলে রেখে টুপি খুললেন। অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভেরি মিসটিরিয়াস মার্ডার ঘটিয়ে ফেলেছেন!'

বারীন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, 'দ্য ব্রিফকেস মার্ডার।'

কর্নেল তাকালেন। একটু পরে বললেন, 'আই সি।'

'উর্মি রায়কে এতদিনে খুঁজে পেয়েছি। ইউ নো দ্য ট্র্যাজিক এপিসোড।'

'হুঁ। বলুন।'

'তাকে এখানে আনা হয়েছে। তার নাম এখন নীতা সোম। ফিল্মস্টার।'

'আর ইউ সিওর ?'

'অফকোর্স। তাকে ডেকে গোপনে সব কথা খুলে বলেছি। প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। তারপর ক্রমশ ভেঙে পড়ল।'

'সৌম্যের কাছে একটা ভার্সান শুনেছি। এবার আপনারটা শোনা যাক।'

বারীন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী কফি এবং কিছু স্ন্যাক্স আনল। বারীন্দ্রনাথ তাকে বললেন, 'দ্বারিককে বলেছি। উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটা কর্নেলসায়েবের জন্য সাফ করে গুছিয়ে রাখে যেন। তুই গিয়ে গ্যাখ কী করছে।'

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হুঁ। বলুন।

বারীন্দ্রনাথ আবার শুরু করলেন। শেষে বললেন, 'একটু আগে থানায় ফোন করেছিলাম। ও সি নরেশ ভদ্র বললেন, মর্গের ফাইন্যাল রিপোর্ট এখনও পাননি। তবে তাঁর ধারণা নাকি সঠিক। ডেডবডির স্টমাকে প্রচুর অ্যালকোহলিক সাবস্ট্যান্স পাওয়া গেছে।'

'অরিত্র সেনের জিনিসপত্র কি পুলিস নিয়ে গেছে ?'

'জানি না। পুলিসের সার্চ করার কথা। তবে কয়েকটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নিয়ে গেছে শুনেছি। আপনি তো জানেন, পুলিস ঝটপট একটা কেস সাজিয়ে ফেলে।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একটু হেসে বললেন, 'আপনি একজন এক্স এম পি। পুলিস একটু বেশি অ্যাকটিভ হতেই পারে। যাই হোক, এই ঘটনায় দুটো পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। প্রথমটা হল, নীতা সোমকে এখানে আসতে নিষেধ করে কেউ হুমকি দিয়েছিল। দ্বিতীয়টা হল, ফিল্ম ম্যাগাজিন।'

'সৌম্য আমাকে দিয়েছিল পত্রিকাটা।'

'আপনি কি ফিল্মম্যাগাজিন নিয়মিত পড়েন ?'

'নাহ্। ওসব ট্র্যাশ পড়তে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু সৌম্য বলল, এখানে যে হিরোইন আসছে, ওতে তার ছবি আছে। তাই একটু কৌতূহল হয়েছিল। দেখাচ্ছি।' বলে বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

কর্নেল বাইনোকুলারে ঝিল দেখতে থাকলেন। উত্তরের বাউণ্ডারি ওয়ালের নীচে ঝিলের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। একজন মধ্যবয়সী পুরুষ এবং যুবতী

রোয়িং করছিল। বোটটা দ্রুত দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কর্নেল বললেন, 'আপনার বোটটা এখনও আছে দেখছি।'

'আছে। মাঝেমাঝে সৌম্য এসে রোয়িং করে।'

'সৌম্য নয়, অন্য কারা রোয়িং করছে দেখলাম।'

'তা হলে ফিল্মের লোকেরা।' বারীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। পত্রিকা এবং সেই ফোটোটা কর্নেলকে দিয়ে বললেন, 'মিলিয়ে দেখে নিন।'

কর্নেল পকেট থেকে আতশ কাচ বের করে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর বললেন, 'হ্যাঁ। মিল আছে। তবে—'

'তবে কী?'

কর্নেল পত্রিকাটি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'আজকাল প্রিন্টিং টেকনোলজি দারুণ উন্নত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত ভুঁইফোড় পত্রিকা বেরুচ্ছে। এটা নতুন পত্রিকা। একেবারে প্রথম সংখ্যা। প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে। এত সব ফুল পেজ কালার ফোটোগ্রাফি!'

বারীন্দ্রনাথ কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'এবার নীতা সোমকে ডেকে পাঠাচ্ছি। মুখোমুখি দেখুন। কথা বলুন।'

কর্নেল হাসলেন। 'নীতা সোমকেই রোয়িং করতে দেখলাম।'

'সে কী! ওকে আমি নিষেধ করেছিলাম আপনি না আসা পর্যন্ত যেন বাইরে না বেরোয়।'

'বোঝা যাচ্ছে, ব্ল্যাক ক্যাট এসকর্ট সার্ভিসের রাত্রি সেনের ওপর ওর আস্থা বেশি।'

'কলকাতার প্রাইভেট ডিটেকটিভদের সঙ্গে আপনার চেনাজানা আছে। রাত্রি সেনকে চেনেন?'

'না। তবে শুনেছি, ব্ল্যাক ক্যাট সিনেমা মহলেই গোয়েন্দাগিরি করে-টরে। আজকাল যেখানেই টাকাকড়ির লেন-দেন, সেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষের গোপন তথ্য জানতে চায়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।' কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি সৌম্যের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'নাহ্। আমি আউটহাউসে গিয়ে অবস্থাটা দেখি।'...

আউটহাউসের সামনে একটা লিম্যুনিজ এবং একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

লিম্যুনিজের ভেতরে দুটো লোক পা তুলে শুয়ে আছে। পুলিসের ছোট্ট দলটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে টহল দেওয়ার ভঙ্গি করছে। কর্নেল চওড়া করিডরে ঢুকে দেখলেন, বাঁদিকের বড় ঘরের মেঝেয় সতরঞ্জি বিছানো এবং একদঙ্গল নানা বয়সী লোক শুয়ে ও বসে ঝিমোচ্ছে। ঘাটের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সৌম্যের সঙ্গে দেখা হল। তার পাশে জিন্স-শার্ট পরা গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার একটি মেয়ে। এই তাহলে রাত্রি সেন। সে ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে ডাকছে, 'নীতা! দ্যাট্স এনাফ। চলে এস। নীতা বোকামি কোরো না।'

সৌম্য গম্ভীর মুখে বলল 'সি দ্যা ফান!'

কর্নেল বললেন, 'ওরা এঞ্জয় করছে।' তারপর রাত্রির দিকে তাকালেন।

রাত্রি তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার ডাকল, 'নীতা! কাম ব্যাক!'

কর্নেল সৌম্যকে বললেন, 'ওই ভদ্রলোক কে?'

সৌম্য খাপ্পা হয়ে বলল, 'জানি না। কোনও চামচা-টামচা হবে। ইউ নো দ্য টার্ম!'

রাত্রি বলল, 'চামচা বলবেন না। প্রতুলবাবুই নীতাকে লাইমলাইটে এনেছেন। কিন্তু প্রব্লেম হল, নীতা রোয়িং জানে না।'

সৌম্য বলল, 'ওই ভদ্রলোক তো জানেন।'

রাত্রি বলল, 'নীতা দুষ্টুমি করছে দেখছেন না? একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেলে কী হবে?'

সৌম্য বলল, 'জোঁকে রক্ত চুষে এক মিনিটে মড়া করে ফেলবে।'

কর্নেল সৌম্যের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'লেট দেম এঞ্জয়। এস।'

করিডরে ঢুকে সৌম্য বলল, 'বোটটা তুলে রাখা উচিত ছিল। আমাকে না জানিয়ে কেউ বোট ব্যবহার করলে আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

বাগানের মাঝামাঝি গিয়ে একটা অশোক গাছের তলায় কর্নেল দাঁড়ালেন। বললেন, 'একটা প্রশ্ন করব। আশা করি ঠিকঠাক জবাব পাব।'

সৌম্য একটু অবাক হল। 'বলুন!'

'তুমি যে ম্যাগাজিনটা তোমার মামাবাবুকে দিয়েছিলে, ওটা কোথায় কিনেছ?'

'ওটা আমার কেনা নয়। অবিনাশদার শুটিং টিমের কেউ এনেছিল। সন্ধ্যায় ওরা এল। আমি ওদের আউটহাউসের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করছিলাম। তখন দেখি, করিডরে ওটা পড়ে আছে। করিডরের সামনে একটা বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালানো হয়েছিল। তা না হলে ওটা চোখে পড়ত না। তারপর পাতা

উল্টে দেখি নীতা সোমের ছবি।'

'তোমার মামাবাবুকে পত্রিকাটা দিতে গেলে কেন ?'

সৌম্য আরও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'মামাবাবুকে—মাই-গুডনেস! এসব পত্রিকা মামাবাবুকে আমি দেব কেন? কোন সাহসে দেব? আশ্চর্য তো।'

'কিন্তু তুমি দিয়েছিলে। ওঁকে বলেছিলে, যে হিরোইন আসবে, এতে তার ছবি আছে।'

'এক মিনিট! আমাকে ভাবতে দিন। আসলে তখন অবিনাশদার টিম এসে গেছে। আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। যে যা বলছিল, তখনই তা করছিলাম। মে বি, সামবডি টোল্ড মি সামথিং—টু ইম্প্রেস হিম। বাট্ হু?' সৌম্য স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। 'হ্যাঁ। আমি যখন ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টে নীতা সোমের ছবি দেখছি, তখন কেউ আমাকে প্রোভোক করে থাকবে। ঠিক মনে করতে পারছি না। নাহ্। অরিত্র নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ আমাকে বলেছিল কিছু। তা না হলে আমি নিজে থেকে—ইম্পসিবল্! কাল ভোরে মা বলছিলেন, নীতা সোমকে নাকি মামাবাবুর চেনা মনে হয়েছে। আমি ওঁর কাছে চলে গেলাম। ঠিক তখনই কিন্তু কথাটা মাথায় একবার এসেছিল। ভীষণ বিব্রতবোধ করছিলাম।'

কর্নেল বাইনোকুলার তুলে একটা পাখি দেখতে দেখতে বললেন, 'যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, প্ল্যানটা মোটামুটি সফল হয়েছে।'

'কিসের প্ল্যান?'

'টু ইম্প্রেস্ মিঃ রায়চৌধুরি। যাই হোক, তুমি গিয়ে তোমার বোটটা উদ্ধার করো।' বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে দক্ষিণে বাগানের ভেতর ঢুকে গেলেন। ওদিকটা জঙ্গল হয়ে আছে।

সৌম্য একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর আউটহাউসের দিকে চলে গেল।···

॥ ছয় ॥

কর্নেলকে দেখে বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার ব্রেকফাস্টের দেরি হয়ে গেল। ভাবছিলাম সেবারকার মত কোন পাখির পেছনে পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও হলেন নাকি! কিংবা একঝাঁক প্রজাপতির সামনে ধ্যানস্থ!'

বারীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন, 'নীচে পুপু ওত পেতে ছিল। প্রচুর খাইয়ে দিল। আতঙ্কে ওর দিশেহারা অবস্থা। সৌম্যকে ফিল্মওয়ালাদের

হাত থেকে যেন বাঁচাই। ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, সিনেমার পর্দায় যারা খুনোখুনি করে, বাস্তবে তারা নিরীহ ভীতু মানুষ। পুপু মানতে চায় না। বলে কী, এই তো চোখের সামনে সত্য খুনোখুনি হল।'

টেলিফোন বাজল। বারীন্দ্রনাথ হুইলচেয়ার গড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। জনি এখন পোর্টিকোর খোলা ছাদে রেলিংয়ে বাঁধা আছে। মুখ ঘুরিয়ে ধমক দিল।

কর্নেল টেবিলে টুপি রেখে চুরুট ধরালেন। তারপর বাইনোকুলারে আউট-হাউস দেখতে থাকলেন। একই দৃশ্য। এখনও কি নীতা সোম এবং তার প্রোমোটার প্রতুলবাবু ঝিলের জলে ভেসে আছেন? এতক্ষণে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক যেন বা।

বারীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ। বললেন, 'ও সি নরেশবাবুর ফোন। মর্গের ফাইন্যাল্ রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। ভিক্‌টিমের মাথার পেছনে রিভল্‌ভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে। গুলিটা হাড়ের খাঁজে আটকে ছিল। গুলি করার পর জ্বালানি কাঠ দিয়ে মাথার পেছনটা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। সদরে সি আই ডি-তে যোগাযোগ করা হচ্ছে।' বলে হাঁক দিলেন 'রুক্মিণী!'

দক্ষিণের বারান্দা থেকে রুক্মিনী ছুটে এল। 'জি বড়াসাব!'

'দ্বারিককে ডাক। শিগগির আসে যেন!'

রুক্মিনী চলে গেল। কর্নেল বললেন, 'সৌম্য বলছিল, ডাইরেক্টর এবং রমেশ ভার্মা নামে এক ভদ্রলোক ভোরে বেরিয়ে গেছেন। তাঁরা কিন্তু এখনও ফেরেননি!'

'পুলিস ওঁদের যেতে দিচ্ছিল না। অবিনাশবাবু এসে আমাকে অনুরোধ করলেন, ওঁর টিমের ম্যানেজার বটুবাবু গোবেচারা মানুষ। একটুখানি ড্রিঙ্ক করলেই নাকি মাতাল হয়ে যান। উনি থানায় গিয়ে ও সি-কে বুঝিয়ে বলবেন। তো আমি এস. আই বঙ্কিবাবুকে ডেকে বলে দিলাম। আফটার অল, অবিনাশবাবু একজন বিখ্যাত ফিল্মডাইরেক্টর।'

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'সৌম্য একটা পয়েন্ট তুলেছে। রমেশ ভার্মা ওয়েস্টে ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম মার্কেটে দালালি করেন। তিনি লোকেশনে কেন?'

'পয়েন্টটা অরিত্রের কাছে কাল আমিও তুলেছিলাম। যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাইনি।'

দ্বারিক এল। বারীন্দ্রনাথ বললেন, 'রামবাহাদুরকে গিয়ে বল, গেটে যেন তালা আটকে দেয়। ভেতর থেকে কেউ যেন বেরুতে না পারে। থানা থেকে

আরও পুলিস আসছে। তারা এলে কাকে বেরুতে দেবে বা না দেবে, তারা বুঝবে। আর শোন, নীচে কোথায় বক্‌সিবাবু আছে, তাঁকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলবি। সাব-ইন্সপেক্টর বক্‌সিবাবুকে তুই তো ভাল চিনিস। তোর দেশের লোক বলছিলি।'

'আজ্ঞে!' বলে মূর্তিমান দৈত্যটি চলে গেল।

নীচে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে গাড়িটা দেখা গেল। বারীন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, 'অবিনাশবাবুর গাডি। বলছিলাম না, বিখ্যাত ফিল্মডাইরেক্টর? কেরিয়ার নষ্ট হোক, এমন কিছু করার মানুষ নন।'

গাড়িটা আউটহাউসের সামনে গিয়ে থামল। কর্নেল ফিল্ম ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টে বললেন, সৌম্য এটা নিজে থেকে আপনাকে দেয়নি। কেউ আপনাকে নীতা সোমের ছবি দেখানোর জন্য আগ্রহী ছিল। সে সৌম্যকে কাজে লাগিয়েছিল।'

'বলেন কী!'

'এই পত্রিকার সম্পাদক লীনা বসু। প্রকাশক প্রতুল বসু। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।' কর্নেল হাসলেন। 'নীতা সোমকে জনৈক প্রতুলবাবু নাকি লাইমলাইটে এনেছেন। ঝিলের জলে নীতার সঙ্গে তাকে রোয়িং করতে দেখলাম। কিন্তু সৌম্য তাকে চেনে না। তার অজান্তে বোট ব্যবহার করার জন্য সৌম্য তাঁর ওপর খাপ্পা। যাই হোক, এ একটা ওয়েল-প্ল্যানড গেম। সৌম্যের ফিল্মে নামার লোভ এবং সরলতাকে এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে।'

বারীন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং বানাতে থাকলেন। দৃষ্টি রিংয়ের দিকে। কিন্তু হাওয়া এসে দুষ্টুমি করে রিংগুলো ভাঙচুর করছিল।

'মিঃ রায়চৌধুরি!'

'বলুন।'

'নাও দ্য ভাইটাল কোয়েশ্চন। এস. কে. রায়ের ব্রিফকেসে নিলামে কেনা দামি ঐতিহাসিক গয়নার কথা সম্প্রতি কেউ বা কারা জেনে গেছে। বাট হাউ? আপনি কি কাকেও—'

'নো, নো! নেভার!' বারীন্দ্রনাথ জোরে মাথা দোলালেন। পুপুকেও বলিনি। কারণ তার পেটে কথা থাকে না। জানি শুধু আমি এবং আপনি।'

'আপনাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, বিজ্ঞাপন দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। বরং কাস্টমস্ ডিপার্টমেন্টের হাতে ব্রিফকেসটা তুলে দিন। ঝুঁকি নেবেন না।'

'মাই গুডনেস্ !' বারীন্দ্রনাথ সোজা হয়ে বসলেন। 'গত জুলাই মাসে কাস্টম্‌সে রেজিস্টার্ড এ. ডি পোস্টে ডিটেল্‌স্ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। অ্যাকৃনলেজমেন্ট রিসিটটা ফিরে এল। কিন্তু কোনও জবাব নেই। অগাস্টের গোড়ায় আবার একটা রিমাইণ্ডার পাঠিয়েছিলাম। রেজিস্টার্ড পোস্টে। নো রিপ্লাই। আপনাকে দেখাচ্ছি।'

বারীন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে হুইলচেয়ার গড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। কর্নেল বাইনোকুলারে দেখছিলেন, সৌম্যের সঙ্গে নীতা সোম আর রাত্রি সেন আউটহাউস থেকে ফিরে আসছে। বারীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে বললেন, 'এই দেখুন। চণ্ডীতলা পোস্ট অফিসের দুটো রিসিট। আর এইটে অ্যাকনলেজমেণ্ট রিসিট।'

বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল সেগুলো দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাকে পোস্ট করতে পাঠিয়েছিলেন?'

'আমার পি. এ. অক্ষয়কে। তাকে আপনি দেখেছেন। লোকসভায় আমার টার্ম শেষ হওয়ার পরও তাকে ছাড়িয়ে দিইনি। অনেক খুচরো বৈষয়িক কাজকর্মের জন্য একজন লোক আমার দরকার ছিল।'

'অক্ষয়বাবু কি এখনও আছেন?'

'না। সেপ্টেম্বরে চলে গেছে। কোথায় ভাল মাইনেতে কাজ পেয়েছে বলল। আমি আপত্তি করিনি। দেখলাম সুদক্ষিণা আছে। অসুবিধে হবে না।'

কর্নেল রিসিটগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাস্টমস ডিপার্টমেণ্টের ঠিকানায় একটা অন্য খামে ভরে একটা সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিলেও পোস্ট অফিস আপনাকে রিসিট দেবে। কাস্টমসের ছাপ দেওয়া অ্যাকনলেজমেণ্ট রিসিটও ফিরে আসবে।'

বারীন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। আস্তে বললেন, 'নাউ আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। কিন্তু অক্ষয়ের এত সাহস হবে?'

'হয়েছে। সে আপনার পি. এ. ছিল। এতদিন পরে কাস্টমসে আপনার চিঠি লেখায় তার কৌতূহল হতেই পারে। কর্নেল চোখ বুঁজে হেলান দিয়ে ফের বললেন, 'কিন্তু অক্ষয়বাবু উর্মির ফোটোগ্রাফ—'

বারীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, 'ছেড়ে দিন। ওটা আলাদা ব্যাপার। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এতদিনে যেভাবে হোক উর্মিকে যখন পেয়েছি, তখন তার হাতে তার বাবার ব্রিফকেস তুলে দিলেই আমার শান্তি।'

কর্নেল হাসলেন। 'কিন্তু উর্মিকে আপনি পাননি মিঃ রায়চৌধুরী।'

'পাইনি ?'

'নাহ্। ইট্‌স্ এ ওয়েল্-প্ল্যান্‌ড গেম। আপনি আসলে অকারণ একটা অপরাধবোধে ভুগছেন। তাই টাইম-ফ্যাক্টর আপনার মাথায় নেই। ব্রিফকেসের ফোটোটা ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড হোয়াইট্।'

'সো হোয়াট্ ?'

'ফোটোগ্রাফটা পুরনো। আর এই পত্রিকার ছবিটা এ মাসেই তুলে ছাপানো হয়েছে।'

'আমি মুখোমুখি ওকে খুঁটিয়ে দেখেছি।'

'চিনা লণ্ঠনের আলোয় দেখেছেন। মেকআপ করা মুখ। অ্যাণ্ড শি ইজ অ্যান অ্যাক্‌ট্রেস।' কর্নেল চাপা স্বরে ফের বললেন, 'নীতা সোম দিনের আলোয় আপনার মুখোমুখি হবে না।'

'আমি ওকে ডাকছি। রুক্মিণী!'

তখনই সাড়া এল। 'জি বড়াসাব।'

'নীচে গিয়ে সৌম্যকে বল, নীতাকে নিয়ে আসবে। নীতা নামটা মনে থাকবে ?'

'জি বড়াসাব! উনিই তো সেনিমার হিরোইন আছে।' রুক্মিণী মুচকি হেসে চলে গেল।

একটু পরে সৌম্য এল। তার মুখ বেজায় গম্ভীর। বলল, 'নীতা রোস্টিং করে টায়ার্ড। তাছাড়া অবিনাশদা এসে ওকে খুব বকাবকি করেছেন।'

কর্ণেল বললেন, 'বসো সৌম্য! বলো, এতক্ষণ আউটহাউসে কী সব হল ?'

সৌম্য হাসল। তারপর বলল, 'কী হবে ? অবিনাশদা ফিরলেন। রমেশ ভার্মা নাকি চণ্ডীতলা বাজারে সিগারেট কিনতে গিয়ে উধাও হয়েছে। আপনি তখন জিজ্ঞেস করছিলেন, কে আমাকে পত্রিকাটা মামাবাবুকে দিতে বলেছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে, ওই লোকটাই বলে থাকবে।'

'কেন মনে হচ্ছে ?'

'পত্রিকাটা ওর হাতে একবার দেখেছিলাম। গুটানো অবস্থায় মুঠোয় ধরে গাড়ি থেকে নেমেছিল। এই তো। এখনও দেখে বোঝা যাচ্ছে। তাই না ?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'তোমার বোটটা কি তুলে রেখে এলে ?'

'নীতার প্রোমোটার প্রতুল বোস নীতাকে নামিয়ে দিয়ে এখনও রোস্টিং করছে। অবিনাশদা ওকে খাতির করেন। বললেন, ওকে চটিও না। কী করবে ? অবিনাশদাকে না করা যায় না।'

কর্নেল বাইনোকুলার তুলে ঝিলের দিকটা দেখতে দেখতে বললেন, 'সৌম্য। তোমার বোট ঝিলের ওপারে চলে গেছে। প্রতুল বোসকে দেখতে পাচ্ছি না। এখনই গিয়ে পুলিসের এস আই বক্‌সিবাবুকে খবর দাও। রমেশ ভার্মার মত প্রতুল বোসও মনে হচ্ছে উধাও হয়ে গেছেন।'

সৌম্য তখনই ছুটে গেল। জনি গরগর করতে থাকল।

বারীন্দ্রনাথ গুম হয়ে বসে ছিলেন। গলার ভেতর বললেন, 'আই ওয়াজ সো ফুলিশ! উর্মির ফোটোগ্রাফটা নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে গত মাসে অক্ষয়কে দিয়ে তিনটে কপি করিয়ে রেখেছিলাম। কলকাতার কোন স্টুডিয়ো থেকে কপি করে এনেছিল অক্ষয়। ও জিজ্ঞেস করেছিল। আমি ওকে শুধু বলেছিলাম, প্লেনক্র্যাশের পর আমার যে সহযাত্রী তুষার খাদে তলিয়ে যান, এটা তাঁর ফ্যামিলিফোটোগ্রাফ। অক্ষয়ের কাছে অন্তত এটুকু গোপন করার অর্থ হয় না।'

কর্নেল বললেন, 'কাস্টমসকে লেখা আপনার গোপন চিঠি এবং এস কে রায়ের ফ্যামিলিফোটো। অক্ষয়বাবু চান্সটা ছাড়তে চাননি। কিন্তু তাঁর দুর্বুদ্ধি। যাদের সাহায্য নিতে গেলেন, তারাই তাঁকে ল্যাং মেরেছে।'

'নীতা সোমকে তা হলে ওই বজ্জাতটাই ফোনে থে্রটন করেছিল!'

'আবার কে?' কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'অবিনাশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

বারীন্দ্রনাথ রুষ্ট মুখে বললেন, 'নীতা সোমকে মিসপার্সোনিফিকেশনের দায়ে ধরিয়ে দেব।'

'মিঃ রায়চৌধুরি! সোমের মত নীতা এই দাবার চালে একটা ঘুঁটি মাত্র। কেরিয়ারের স্বার্থে সে উর্মির রোলে অভিনয় করেছে মাত্র। আফটার অল সে একজন অভিনেত্রী। তার কথা ভুলে যান। তাছাড়া মিঃ রায়ের ব্রিফকেস পুলিসের হাতে থাক, এটা আমি উচিত মনে করি না। চিন্তা করুন। চীনের প্রাচীন মিঙ্ রাজবংশের এক রাজকুমারীর জড়োয়া নেকলেস। এই অলঙ্কারের একটা অসাধারণ ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। আপাতত-প্লিজ কিপ ইট ইন ইওর কাস্টডি। যথাসময়ে আমি বলব এবার আপনাকে কী করা উচিত।'

বারীন্দ্রনাথ আবার সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ার রিংগুলো নিয়ে আবার হাওয়ার দুষ্টুমি শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলেন কর্নেল নীচের রাস্তায় আউট-হাউসের দিকে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ বাইনোকুলার তুলে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ডানদিকে বাগানের ভেতর অদৃশ্য হলেন। ওঁর এই অদ্ভুত বাতিক।

এই সময় জনি মুখ ঘুরিয়ে গরগর করতে থাকল। বারীন্দ্রনাথ ঘুরে দেখলেন, নীতা সোম আসছে। তার পেছনে ব্ল্যাক ক্যাট। নীতা এসে খুব আস্তে বলল, 'আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

বারীন্দ্রনাথ শান্তভাবে বললেন, 'বসো।'....

নীচে নামো বাঁয়ে ঘোরো

রাজপুরোহিত এবং ছমকি

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিবিষ্ট মনে একটা বই পড়ছিলেন। হঠাৎ বইটা বুজিয়ে টেবিলে রেখে বললেন, 'সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতার সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য। বর্বরতা ছাড়া সভ্যতা হয়তো টেঁকে না।'

একটু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর চুরুট থেকে আর সেই নীল ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা রেখাটা নেই। তার মানে, চুরুটটা কখন নিভে গেছে। তাঁর সাদা দাড়িতে একটুকরো ছাই এখনও আটকে আছে। ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি অভ্যাস মতো চোখ বুজে টাকে হাত বুলোচ্ছেন। বললাম, 'বর্বরতাকে কি সত্যিই সভ্যতার মধ্যে আবিষ্কার করলেন? নাকি ওই বইয়ে কথাটা ছাপানো আছে?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'না জয়ন্ত! বইটা পড়তে পড়তে কথাটা আমার মাথায় এল।'

'কী বই ওটা?'

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দেয়ালঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

তাঁর প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণ ভেতর থেকে সাড়া দিল, 'যাচ্ছি বাবামশাই!'

'চারটে পাঁচ বেজে গেছে।' কর্নেল দাড়ি থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিরক্ত মুখে বললেন। 'ষষ্ঠীর এই একটা অদ্ভুত স্বভাব। মিসেস অ্যারাথুনের বেড়ালটাকে দেখতে পেলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। জানালার পাশে লাঠি হাতে ওঁত পেতে থাকে। নির্বোধ আর কাকে বলে? ও বুঝতেই পারে না অত মোটাসোটা একটা বেড়াল জানলার গ্রিল গলিয়ে ঘরে ঢুকবে কী করে?'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স্ নিয়ে এই ড্রয়িংরুমে ঢুকেছিল। সে টেবিলে ট্রে রেখে গোমড়ামুখে বলল, 'আমি কি বেড়াল দেখছিলাম? অবেলায় খুব মেঘ করেছে। বিষ্টি হলেই কেলেঙ্কারি। রাস্তা একেবারে নদী হয়ে যাবে।'

কথাটা বলে সে তেমনি গোমড়ামুখে চলে গেল। বললাম, 'আপনি একটু

আগে সভ্যতা আর বর্বরতার কথা বলছিলেন। সভ্যতার প্রতীক এই কলকাতার রাস্তা এক পশলা বৃষ্টিতে সত্যিই নদী হয়ে যায়? বোঝা যাচ্ছে, ষষ্ঠীও সভ্যতার মধ্যে বর্বরতাকে আবিষ্কার করেছে। কারণ বৃষ্টির কলকাতাকে আর সভ্য বলেই মনে হয় না।'

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে কফিতে মন দিলেন। তা[illegible] মিনিট পরে মুহুর্মুহু মেঘের গর্জন এবং তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শরৎকা[illegible] বৃষ্টি অবশ্যি এভাবেই এসে পড়ে। তিনতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা আবছা আঁধারে ভরে গিয়েছিল। ষষ্ঠী চুপচাপ এসে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, 'হুঁ। বর্বরতা তোমাকে সম্ভবত আজ রাতের মতো আটকে দিল। না পারবে তোমার পত্রিকা অফিসে যেতে, না পারবে সল্টলেকে বাড়ি ফিরতে। তবে হ্যাঁ—ডিনারে তুমি সভ্যতার স্বাদ পাবে। ষষ্ঠী তোমাকে ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন খাওয়াবে।'

আঁতকে উঠে বললাম, 'সর্বনাশ! অফিসে না ফিরলেই নয়। রিপন স্ট্রিটে পুলিস রেডের খবরটা খুব জরুরি। আমারই ভুল। কেন যে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'তুমিই বলছিলে রেড করে পুলিস কোনও চোরাই মাল পায়নি!'

'তা পায়নি। তবে এটাও তো একটা খবর।'

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন। 'পুলিসের নিছক রেড করাও কি একটা খবর? জয়ন্ত! আজকাল দেখছি খবরের কাগজের যা মতিগতি, ষষ্ঠীর হাতে মিসেস অ্যারাথুনের বেড়ালটা দৈবাৎ আক্রান্ত হলেও সেটা একটা খবর হয়ে উঠবে। তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সুনাম এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।'

এই সময় ডোরবেল বাজল। একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল, 'এক পুরুতঠাকুর এসেছেন বাবামশাই!'

কর্নেল তার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'তুই কী করে জানলি পুরুতঠাকুর এসেছেন?'

ষষ্ঠীচরণ হাসল। 'চেহারা দেখেই মানুষ চেনা যায়। পুরুতঠাকুর কি আমি কখনও দেখিনি?'

'খুব হয়েছে। নিয়ে আয়।'

এরপর যিনি কর্নেলের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন, তাঁকে দেখামাত্র বুঝলাম ষষ্ঠী চিনতে ভুল করেনি। আগন্তুক বয়সে প্রৌঢ়। তাঁর গায়ে সাদা উত্তরীয় জড়ানো, পরনে খাটো ধুতি, কপালে লাল তিলক এবং খুঁটিয়ে ছাটা চুলের কেন্দ্রে গিঁট দিয়ে বাঁধা শিখাও আছে। পৈতে তো আছেই। নমস্কার করে কাঁচুমাচু মুখে তিনি বললেন, 'আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা বলতে চাই।'

'বলুন!'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'কথাটা প্রাইভেট।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। আমাকে কেউ যা কিছু গোপন কথা বলুন, জয়ন্তর তা অজানা থাকবে না।'

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে বললেন, 'আমার সৌভাগ্য! সত্যসেবক পত্রিকায় আপনার লেখার মাধ্যমেই কর্নেল সায়েবের পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের কাগজের অফিস থেকে কর্নেল সায়েবের ঠিকানা যোগাড় করে সোজা এখানে চলে এলাম। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।'

কর্নেল বললেন, 'আপনি গাড়িতে এসেছেন দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পুরুতমশাইয়ের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কাগজে যা পড়েছি, ঠিক তা-ই। আপনি সত্যিই—'

'না। অন্তর্যামী নই। আপনি একটুও ভেজেননি। এই বাড়ির নীচে পোর্টিকো আছে। যাই হোক, যা বলার শিগগির বলুন। কারণ রাস্তায় জল জমে গেলে আপনার গাড়ি ফেঁসে যাবে।'

পুরুতমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আপনি মোহনপুরের রাজবংশের কথা শুনে থাকবেন। দমদম এরিয়ায় ওঁদের একটা প্যালেস আছে। নামেই এখন মোহনপুর প্যালেস। জরাজীর্ণ খাঁ খাঁ অবস্থা। ওই বাড়িতে ওঁদের আরাধ্য দেবতা শ্রীবিষ্ণুর মন্দির আছে। সেই মন্দিরের সেবাইত আমি। আমার নাম নরহরি ভট্টাচার্য।'

"বেশ। কী ঘটেছে বলুন?'

ভট্টাচার্যমশাই আরও চাপা গলায় বললেন, 'কথাটা কুমারবাহাদুরকে বলতে সাহস পাইনি। উনি বৃদ্ধ মানুষ। তার ওপর গত মাসে বাথরুমে পড়ে গিয়ে

পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী। ওঁর বউমা ছন্দা আমাকে বাবার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাই তাঁকেই শুধু জানিয়েছি! কুমারবাহাদুরকে জানাতে নিষেধ করেছি। তো ছন্দা আমাকে পুলিসের কাছে যেতে বলেছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম—'

'সংক্ষেপে বলুন। বৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে।'

'মন্দিরের লোহার দরজা ব্রিটিশ আমলে সায়েব কোম্পানীর তৈরি। ওতে একটা অদ্ভুত তালা আছে। সেই তালা কীভাবে খুলতে হয়, তা জানেন শুধু কুমারবাহাদুর আর আমি। তো সম্প্রতি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, শ্রীবিষ্ণুর বুকের কাছে একটা রেখা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা' চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, নিরেট সোনার মূর্তির রঙ কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। এত বছর ধরে আমি শ্রীবিষ্ণুর সেবা করছি। কিন্তু এমন তো কখনও দেখিনি! তাই মনে একটা খটকা লেগেছে।'

'আপনার খটকা কি এই যে, আসল মূর্তিটা কেউ হাতিয়ে নিয়ে অবিকল একই চেহারার একটা নকল মূর্তি বসিয়ে রেখেছে?'

''আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। কুমারবাহাদুর জানতে পারলে সর্বনাশ হবে। আপনি যদি দয়া করে আসল মূর্তিটা উদ্ধার করে দেন, প্রাণে বেঁচে যাব।'

'কুমারবাহাদুরের ছেলে, মানে ছন্দাদেবীর স্বামী কী করেন?'

'মৃগেন্দ্র গত বছর ক্যান্সারে মারা গেছে। সে একটা কোম্পানীতে বড় পোস্টে চাকরি করত। তার মৃত্যুর পর ছন্দা শ্বশুরমশাইয়ের কাছেই আছে। একমাত্র সন্তান ছিল মৃগেন্দ্র।'

'যে গাড়িতে এসেছেন, সেটা কার?'

'মৃগেন্দ্রের গাড়ি। গাড়িটা ছন্দা স্বামীর স্মৃতি বলে বেচে দেয়নি। নিজেই ড্রাইভিং শিখেছে।'

'এবং আপনিও ড্রাইভিং শিখেছেন!'

নরহরি ভট্টাচার্য আড়ষ্টভাবে একটু হেসে বললেন, ''আজ্ঞে, এ বয়সে ড্রাইভিং শেখা শক্ত। তবে বাধ্য হয়েই শিখতে হয়েছে। ছন্দা তো সবসময় শ্বশুরমশাইয়ের সেবাযত্ন নিয়ে ব্যস্ত। মাইনে দিয়ে ড্রাইভার পোষারও ক্ষমতা নেই। তাই ছন্দা আমাকে তাগিদ দিয়েছিল। কিন্তু আপনি দেখছি, সত্যিই—'

'না। আপনার হাতে গাড়ির চাবি দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, আর দেরি করবেন না। রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে।'

ভট্টাচার্যমশাই উঠে দাঁড়ালেন। আবার নমস্কার করে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। লোহার কপাট না ভাঙলে মন্দিরে চোর ঢোকা অসম্ভব। দয়া করে যদি একবার পায়ের ধুলো দেন, ভালো হয়। এই নিন। মোহনপুর প্যালেসের ঠিকানা আমি লিখে এনেছি।'

ভাঁজ করা একটা কাগজ দিয়ে রাজবাড়ির পুরোহিত দ্রুত প্রস্থান করলেন। দেখলাম, কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে ঠিকানাটা খুঁটিয়ে দেখছেন। একটা ঠিকানা পড়ার জন্য আতস কাচ কেন দরকার হল বুঝতে পারলাম না।

উঠে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে নীচের রাস্তার অবস্থা দেখে এলাম। বৃষ্টি সমানে ঝরছে। তবে এখনও রাস্তায় বেশি জল জমেনি। এখনই বেরিয়ে পড়তে পারলে অফিসে না ফিরে বরং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে সল্টলেকে ফিরতে পারতাম।

কর্নেল আতস কাচ এবং ঠিকানাটা ড্রয়ারে রেখে বললেন, তুমি কী চিন্তা করছ, তা বুঝতে পারছি জয়ন্ত! কিন্তু তুমি ইলিয়ট রোড থেকে যদি বা বেরুতে পারো, মল্লিকবাজারের সামনে জ্যামে আটকে যাবে। কারণ আমি দেখেছি, এই সময়টাতে ওখানে প্রতিদিন ট্রাফিক জ্যাম হয়। এদিকে বৃষ্টি পড়লেই সব গাড়ি যেন বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখন তুমি যদি শর্টকাটে যেতে চাও, তোমাকে ই এম বাইপাসে পৌঁছুতে দরগা রোড ধরতে হবে। সেখানে ততক্ষণে একহাঁটু জলে তোমার পেট্রোল কার ফেঁসে যাবে। কাজেই চুপটি করে বসো।'

অগত্যা চুপটি করেই বসে রইলাম। কর্নেল ষষ্ঠীকে ডেকে আরেক পেয়ালা কফির হুকুম দিয়ে সেই গাব্দা বইটা টেনে নিলেন। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, বইটার নাম 'দি মিসটিরিয়াস বাটারফ্লাই'।

আমার বৃদ্ধ বন্ধুর অবিশ্যি পাখি-প্রজাপতি-ক্যাক্টাস-অর্কিড এসব বিষয়ে প্রচণ্ড বাতিক আছে। কোথাও বাইরে গিয়ে বিরল প্রজাপতির খোঁজে দিনভর টো টো করে ঘোরেন। কিন্তু 'রহস্যময় প্রজাপতি' ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিছুক্ষণ পরে ষষ্ঠী কফি দিয়ে গেল এবং চোখ নাচিয়ে ফ্রায়েড রাইস—চিকেনের আভাসও দিল। কর্নেলের দৃষ্টি বইটার পাতায়। বৃষ্টি কখনও জোরে কখনও আস্তে প্রকৃতির অর্কেস্ট্রা শোনাচ্ছে।

কফি খেতে খেতে হঠাৎ মোহনপুর রাজবাড়ির বিষ্ণুমূর্তির কথা মনে পড়ে

গেল। আজকাল দামি রত্নের মূর্তি বলেও নয়, যে-কোনও মূর্তি প্রাচীন হলেই বিদেশে চড়া দামে পাচার হয়ে যায়। তবে এই মূর্তিটা নাকি নিরেট সোনার। যদি কোনও চোর সেটা হাতিয়ে থাকে, সোনা বেচেই সে বড়লোক হয়ে যাবে।

কতক্ষণ পরে টেলিফোনের শব্দে আমার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। কর্নেল বললেন, 'ফোনটা ধরো জয়ন্ত!'

ফোন তুলে সাড়া দিতেই কেউ ধমক দিল, 'এই ব্যাটা বুড়ো ঘুঘু! মরণ ফাঁদ পাতা আছে। সাবধান!' তার পরই লাইন কেটে গেল। ফোন রেখে কর্নেলের দিকে তাকালাম। আমার বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠেছিল। তখনও কাঁপুনি থামেনি।

কর্নেল মুখে তুলে একটু হেসে বললেন, 'কেউ হুমকি দিল তো? বাহ্! খুব ভালো।'…

হত্যাকাণ্ড এবং অদ্ভুত তালা

কর্নেল আমার মুখ দেখেই কীভাবে বুঝেছিলেন কেউ টেলিফোনে হুমকি দিল, তা জানি না। অবশ্যি এমন হতেই পারে, আমার মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছিল। কিন্তু হুমকি দিলে সেটা কেন কর্নেলের কাছে 'খুব ভালো' হয়। এইতে একটু অবাক হয়েছিলাম। উনি কি এমন হুমকির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন?

প্রশ্নটা বার দুই তুলে কোনও জবাব পাইনি। তবে আমার কপাল গুণে বৃষ্টিটা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ থেমে গিয়েছিল। রাত ন'টায় জানালায় উঁকি মেরে দেখেছিলাম রাস্তায় জল প্রায় নেমে গেছে। তাই কর্নেলকে তাগিদ দিয়ে সকাল-সকাল ডিনার খেয়ে সল্টলেকে ফিরে গিয়েছিলাম।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে কখনও রাত কাটাইনি এমন নয়। কিন্তু সমস্যা হল, সঙ্গে রাতের পোশাক না থাকলে ওই বিশালদেহী মানুষের রাতের পোশাক পরে শুতে হয়। সেটা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর। তাঁর পোশাকে আমার মতো আড়াইখানা লোক ঢুকে যেতে পারে। তা ছাড়াও ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা আমার অভ্যাস। এদিকে ষষ্ঠীচরণ সাতটা বাজলেই আমাকে বেডটি খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সকালে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল! তখন সাড়ে সাতটা বাজে। বিরক্ত হয়ে টেলিফোন তুলে অভ্যাস মতো বললাম, 'রং নাম্বার!'

'রাইট নাম্বার ডার্লিং!'

হেসে ফেললাম। 'প্লিজ কর্নেল! এই ডার্লিং বালাটা আপনি ছাড়ুন তো! লোকেরা এই নিয়ে—'

'ডার্লিং! পুরনো বাংলা প্রবাদ আছে, কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ! তোমার—মানে সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরির পৌষ মাসের খবর আছে।'

'কিন্তু সর্বনাশটা কার হল?'

'মোহনপুর রাজমন্দিরের সেবাইতমশাইয়ের।'

'তার মানে?'

'আজ ভোরে রাজমন্দিরের দরজার সামনে তাঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে। শিগগির চলে এস।' বলেই কর্নেল মত বদলালেন। 'নাহ্। আমাদের দমদম এরিয়ায় যেতে হবে। কাজেই তুমি বরং তৈরি হয়ে থাকো। আমি ট্যাক্সি করে তোমার কাছে যাচ্ছি। তারপর তোমাকে নিয়ে বেরুব।'

কর্নেলের ফোনের লাইন কেটে গেল। কিন্তু তখনও আমি ফোন ধরে বসে আছি। এ তো ভারী অদ্ভুত ঘটনা! ভট্টাচার্যমশাইকে কাল বিকেলে বৃষ্টির সময় জলজ্যান্ত দেখেছি। আর উনি এখন ডেডবডি হয়ে গেলেন! সোনার বিষ্ণুমূর্তি হাতিয়েও চোর ওঁকে প্রাণে মারল কেন? উনি কর্নেলের কাছে এসেছিলেন, শুধু এটাই কি তাঁকে হত্যার কারণ হতে পারে?

নাহ্। এক রহস্যভেদীর সঙ্গদোষে আমিও দেখছি রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। আমার দরকার একটা জমকালো প্রতিবেদন, আজকাল সংবাদপত্রের পরিভাষায় যাকে বলে 'ইনভেস্টিগেটিভ স্টোরি'।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেলাম। তারপর ব্যাপারটা মাথা থেকে মুছে ফেললাম।

কর্নেল এলেন প্রায় সাড়ে আটটায়। বললেন, 'ই এম বাইপাসে দুর্ঘটনা লেগেই আছে। দুবার ট্যাক্সি বদল করতে হয়েছে। তুমি তৈরি তো?'

তৈরি হয়েই ছিলাম। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'নরহরি ভট্টাচার্যের মার্ডার হওয়ার খবর কি আপনি পুলিসসূত্রে পেয়েছেন?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'না। ছন্দা রায়চৌধুরী আমাকে সাতটা নাগাদ ফোনে জানিয়েছেন।'

'তিনি আপনার ফোন নাম্বার কী ভাবে জানলেন?'

'গত রাতে ভটচায্‌মশাই ওঁকে আমার কাছে আমার কথা বলেছিলেন। আমার ঠিকানা-ফোন নাম্বারও তাঁকে দিয়েছিলেন। ভটচায্‌মশাই কাল তোমাদের পত্রিকা অফিস থেকেই আমার ঠিকানা যোগাড় করেন, তা তুমি শুনেছ।'

'কিন্তু ফোন নাম্বার?'

কর্নেল হাসলেন। 'আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি, তোমাদের নিউজ ব্যুরোর চিফ অমরেশবাবুর টেবিলে কাচের তলায় আমার নেমকার্ড রাখা আছে। কাজেই ফোন নাম্বারের ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই।'

'ছন্দা আপনাকে ডিটেলস কিছু কি জানিয়েছেন?'

''এখন কোনও কথা নয়। গাড়ি ড্রাইভ করার সময় তুমি কথা বললে আমার ভয় হয়।' বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। 'ই এম বাইপাস আর এই ভি আই রোড, তুটো রাস্তাই বিপজ্জনক। নাহ্‌। আস্তে চলো। অত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।'

গাড়ির গতি কমিয়ে বললাম, 'দমদম এলাকা আমার কাছে গোলক ধাঁধা মনে হয়। আপনি মোহনপুর প্যালেসে কীভাবে পৌঁছুতে হবে জেনে নিয়েছেন তো?'

'ডার্লিং! মোহনপুর প্যালেসে আমি বছর পনের আগে বহুবার গেছি। কুমারবাহাতুর সত্যেন্দ্রনাথ আমার সুপরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয় মানুষ। উনি আমার মতোই প্রকৃতিপ্রেমী।'

''বলেন কী!'

'হ্যাঁ। বিহারের মোহনপুরে ওঁর ঠাকুর্দার জমিদারি মহল ছিল। সেই বাড়িতেও একবার গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু ভটচায্‌মশাইকে তো কাল আপনি এসব কথা কিছু-ই বললেন না?'

'নাহ্‌। গাড়ি চালানোর সময় কথা নয়। আর শোনো। আমার মনে হচ্ছে, এই ধরনের রাস্তায় গাড়ি আস্তে চালানোই বিপজ্জনক। তোমার খুশিমতো ড্রাইভ করো!'

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুর এ ধরনের খেয়ালের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এই-রকম মানুষকেই সম্ভবত 'আনপ্রেডিক্টেবল্‌ ম্যান' বলা হয়। ওঁর নির্দেশমতো

গোলকধাঁধার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে যখন মোহনপুর প্যালেসে পৌঁছুলাম, তখন খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। একটা এঁদো পুকুরের ধারে জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ি। অবিশ্যি একটা ফটক আছে। ফটকে আটকানো মার্বেল ফলকটা পড়া যায় না। ফটক হাট করে খোলা। ভেতরটা জঙ্গল হয়ে আছে। সংকীর্ণ রাস্তায় কোন আমলে পাথরের ইঁট বসানো হয়েছিল। এখন খানাখন্দে হতশ্রী হয়ে গেছে। বাউণ্ডারি ওয়াল মুখ থুবড়ে পড়েছে। সাবধানে এগিয়ে পোর্টিকোর তলায় গাড়ি দাঁড় করালাম। পোর্টিকোর যা অবস্থা, ভয় হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে যেন। সামনে একটা অ্যাজবেস্টস চাপানো চালাঘরে একটা কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখে বুঝলাম, ওই গাড়ি চালিয়েই কাল বিকেলে ভটচায্‌মশাই কর্নেলের বাড়ি গিয়েছিলেন এবং ওটাই গাড়িটার গ্যারাজ ঘর।

সিঁড়ির মাথায় একটুকরো বারান্দা। সেখানে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে ছাইরঙা সাধারণ তাঁতের শাড়ি। মহিলাদের বয়স আঁচ করার সাধ্য আমার নেই। তবে মনে হল, এঁর বয়স তিরিশের কাছাকাছি। মুখে তীক্ষ্ণ লাবণ্য এবং ব্যক্তিত্ব আছে। আমরা নামলে তিনি নমস্কার করে মৃদুস্বরে কর্নেলকে বললেন, 'আপনার অনেক গল্প আমি শ্বশুর মশাইয়ের কাছে শুনেছি। আপনাকে দেখে সাহস পেলাম। আসুন!'

কর্নেল বললেন, "পুলিস কি বডি নিয়ে চলে গেছে?"

"একঘণ্টা আগে। পুলিসের মতে ব্যক্তিগত শত্রুতা! কারণ ভটচায্‌কাকুর সঙ্গে নাকি পাড়ার লোকেদের সদ্ভাব ছিল না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তবে কিছু লোক খানিকটা জমি জবরদখল করতে চেয়েছিল। উনি বিরোধী পক্ষের কিছু লোক নিয়ে তাদের বাধা দিয়েছিলেন।"

'কোনও ভিড় দেখলাম না কোথাও।' কর্নেল সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন। একটা খুনোখুনি হলে লোকেরা জটলা করে। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যেন কিছুই ঘটেনি।'

ছন্দা বললেন, 'গেটের কাছে জটলা হচ্ছিল। পুলিস বডি নিয়ে যাওয়ার পর জটলা ভেঙে গেল। আসলে খুনোখুনি আজকাল লোকের যেন গা সওয়া হয়ে গেছে।'

হলঘরে সেকেলে কিছু আসবাব আর দেয়ালে পেন্টিং সাজানো আছে। সবই বিবর্ণ এবং জীর্ণ। হলঘরের একধারে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। কর্নেল বললেন, 'ভটচায্‌মশাইয়ের ফ্যামিলি কোথায় থাকে?'

'ওঁর কোনও ফ্যামিলি ছিল না। বিয়ে করেননি। আমাদের ফ্যামিলির মানুষ হিসেবেই ছিলেন। বাজার করা, রান্নাবান্না সবই উনি করতেন। আমাকে 'সংসারের কোনও কাজে হাত লাগাতে দিতেন না। তাই—' ছন্দা অশ্রু সম্বরণ করে বললেন, 'কাজের লোক রাখতে দেননি। এমন কি আমার মেয়ে টিনিকেও উনি রোজ গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। আবার স্কুল থেকে নিয়েও আসতেন।'

'আমি আসছি এ কথা কি আপনার শ্বশুরমশাইকে বলেছেন?'

সিঁড়িতে ছন্দা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'উনি অসুস্থ মানুষ। ওঁকে কিছু বলিনি এখনও। পুলিসকেও ওঁকে ডিসটার্ব করতে নিষেধ করেছিলাম।'

'উনি কি এখনও জানেন না ভটচায্‌মশাই খুন হয়েছেন?'

ছন্দা আস্তে বললেন, 'না, ওঁর সারারাত ঘুম হয় না। শেষ রাতে ঘুমোন। বেলা এগারোটার আগে ঘুম ভাঙে না। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। ওঁকে খাওয়ানো যায়নি। কোনও ওষুধই উনি খান না। আসলে শ্বশুরমশাই খুব আত্মবিশ্বাসী মানুষ। উনি বলেন, 'ওঁর অসুখ মনের জোরেই সেরে যাবে।'

কর্নেল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তা হলে কুমার বাহাদুর ঘুম থেকে না জাগা অব্দি আমরা ওপরে যাচ্ছি না। বরং ততক্ষণ আমাদের মন্দিরে নিয়ে চলুন।'

'আগে অন্তত এক কাপ কফি—'

'ধন্যবাদ। পরে হবে। আগে ঘটনাস্থল দেখা দরকার।'

সিঁড়ি থেকে নেমে ছন্দা হলঘরের অন্যদিকে একটা দরজার তালা খুললেন। বললেন, 'এই দরজার ডুপ্লিকেট চাবি ভটচায্‌ কাকুর কাছে থাকত। উনি খুব ভোরে স্নান করে এই দরজা খুলে মন্দিরে পুজো করতে যেতেন।'

একটা সংকীর্ণ করিডরের পর আবার একটা সিঁড়ি এবং নীচে একটুকরো উঠোনের প্রান্তে ছোট্ট একটা মন্দির দেখতে পেলাম। উঠোন ঘেরা উঁচু পাঁচিলটার অবস্থাও জরাজীর্ণ। মন্দিরের পাশে একটা দরজা দেখিয়ে ছন্দা বললেন, 'ওদিকে একটা পুকুর আছে। তবে বহুবছর ওই দরজাটা আমরা খুলি না। এই দেখুন! এখানে ভটচায্‌কাকুর ডেডবডি পড়ে ছিল।'

মন্দিরের সামনে একটুকরো খোলা বারান্দা। পুরোটাই মার্বেল পাথরে বাঁধানো। বারান্দায় ওঠার জন্য মাত্র একটা ধাপ আছে। সেটা অবশ্য সিমেন্টের। কর্নেল বারান্দার নীচে গিয়ে বললেন, 'বারান্দা কি ধোয়া হয়েছে।'

'পুলিস ধুয়ে দিতে বলে গেল। একটুখানি রক্ত ছিল। তাই ধুয়ে দিয়েছি।'

'বডি তো আপনিই দেখতে পেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। তখন প্রায় ছটা বাজে। এখানে প্রচণ্ড মশা। তাই মশারি খাটাতে হয়। তার ওপর শেষ রাত থেকে লোডশেডিং ছিল। মশারি থেকে বেরিয়েছি, তখন কারেন্ট এল। তারপর জানালা দিয়ে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ভটচায্‌কাকু উপুড় হয়ে মন্দিরের দরজার সামনে পড়ে আছেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি কী হয়েছে। তক্ষুনি এখানে চলে এলাম। এসে দেখি, মাথার পেছনে চাপ-চাপ রক্ত। তখনও ওঁর পা দুটো নড়ছিল। তাই ওঁকে ধরে চিত করতে গেলাম। উনি অতিকষ্টে শুধু বললেন, বীরু! তারপর ওঁর শরীর স্থির হয়ে গেল।'

'কী বললেন ? বীরু'—

'হ্যাঁ। বীরু। কিন্তু বীরু—'

'বলুন!'

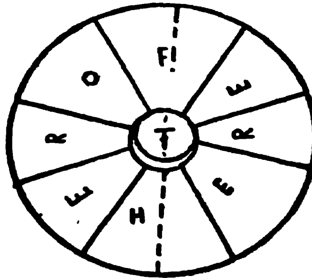
ছন্দা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার স্বামীর এক কলিগ ছিলেন। তাঁর নাম বীরেশ্বর সেন। আমার স্বামীর সঙ্গে এ বাড়িতে তিনি আসতেন। তাঁকে ও বীরু বলে ডাকত।'

ছন্দা হঠাৎ চুপ করলে কর্নেল বললেন, 'আপনি বীরু কথাটা শুনেছিলেন তা হলে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বীরুবাবু তো আমেরিকায় থাকেন। মাস তিনেক আগে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ তিনি জানতেন না। জানার পর চিঠিটা লিখে পাঠিয়েছিলেন।'

'চিঠিটা আছে আপনার কাছে ?'

'খুঁজে দেখতে হবে।'



কর্নেল মন্দিরের বারান্দায় ওঠার ধাপের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভটচাযমশাই বলছিলেন, মন্দিরের দরজা লোহার। ঠিক তা-ই দেখছি। আর লকটা—ভারী অদ্ভুত লক তো!'

ছন্দা বললেন, 'হ্যাঁ। মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। ওটা কীভাবে খোলা যায়, তা জানতেন ভটচাযকাকু, আর জানেন আমার শ্বশুরমশাই।"

কর্নেল পকেট থেকে একটা নোট বই বের করে গোলাকার অদ্ভুত তালাটা আঁকতে ব্যস্ত হলেন।

লক্ষ্য করলাম, তালাটার মধ্যিখানে রোমান হরফে 'টি' লেখা ছোট্ট বৃত্তটা একটা নব্ এবং সেই নব্‌টা উঁচু হয়ে আছে। তা ছাড়া তালাটা বসানো আছে লোহার দুটো কপাটের ঠিক মাঝখানে। দরজার আয়তন প্রায় ৬ ফুট লম্বা এবং প্রায় ৪ ফুট চওড়া। তালাটা দরজা খুললে দু ভাগ হয়ে যায়।

কর্নেল জুতো খুলে বারান্দায় উঠলেন। তারপর আতস কাচ বের করে কপাট পরীক্ষায় মন দিলেন। ছন্দা বললেন, 'মন্দিরের দরজাটা লোহার বলা হয় বটে, কিন্তু আমার ধারণা ওটা ইস্পাতের। কারণ ওতে কোথাও মরচে ধরতে দেখিনি।'

কর্নেল নবটা কয়েকবার ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'সম্ভবত এতে কোনও সূক্ষ্ম ব্যালান্সের ব্যাপার আছে। নবটা খুবই মসৃণ। লেটারগুলো এক জায়গায় স্থির দেখাচ্ছে। কিন্তু নব ঘোরালেই ওগুলো যেন পিছলে যাচ্ছে একটার পর একটা। অসাধারণ কারিগরি কৌশলে এটা তৈরি করা হয়েছিল।'

কর্নেল নেমে এসে জুতো পরলেন। তারপর হঠাৎ বারান্দার ধাপের নীচে বাঁদিকে ঝুঁকে পড়লেন। আঙুল দিয়ে কী একটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আপনি কি কোনও ওয়াশিং পাউডার দিয়ে বারান্দা ধুয়েছেন?'

ছন্দা বললেন, 'না তো! এমনি দু বালতি জল ছিটিয়ে ধুয়েছি।'

'হুঁ। বডি কী অবস্থায় ছিল বলুন?'

ছন্দা আঙুল দিয়ে দেখালেন। 'দরজার কাছে মাথা আর শরীরের বাকি অংশ লম্বালম্বি পড়ে ছিল। পা দুটো ছিল এই ধাপের ওপর।'

কর্নেল নিজের আঙুল দেখতে দেখতে বললেন, 'একটু জল চাই।'

'ওই ট্যাপের জলে হাত ধুয়ে নিন। কিছু নোংরা লেগেছে কি? এখানে নোংরা কিছু থাকার কথা নয়। রোজ ভটচাযকাকু দুবেলা মন্দির আর উঠোন পরিষ্কার করতেন।'

কর্নেল উঠোনের কোণে কয়েকটা ফুলগাছের পাশে একটা ট্যাপ খুলে রগড়ে হাত ধুলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'খুনি খুব ধূর্ত। বারান্দার ওই ধাপে গ্লিসারিন জাতীয় কোনও আঠালো পিচ্ছিল লিকুইড জিনিস ছড়িয়ে রেখেছিল।'

ছন্দা চমকে উঠলেন। 'সে কী! কেন?'

'ভটচাযমশাই খালি পায়ে মন্দিরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাবেন। তখন তাঁর মাথার পেছনে মোক্ষম আঘাতের সুযোগ পাওয়া যাবে। তিনি দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে কাজটা তত সহজ হত না, যতটা সহজ হয়েছে উনি পড়ে যাওওয়ার ফলে।' বলে কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। 'চলুন! এবার চা বা কফি কিছু খাওয়া যাক। আমি অবিশ্যি কফিরই ভক্ত।'

ছন্দা করিডরে ঢুকে বললেন, 'শ্বশুরমশাইয়ের কাছে শুনেছি আপনি কফির ভক্ত। কিন্তু আমার অনুরোধ কর্নেলসায়েব! আমাকে আপনি তুমি বলে ডাকবেন।'

'ঠিক আছে। তো ছন্দা, তুমি কি কাল রাতে ভটচাযমশাইকে বলেছিলে যে আমি কুমার বাহাদুরের পরিচিত?'

'বলেছিলাম। শুনে উনি খুব অবাক হয়েছিলেন।' ছন্দা হলঘরের সেই দরজায় তালা এঁটে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। দোতলার বারান্দায় উঠে একটা ঘরের দরজা দেখিয়ে আস্তে বললেন, "এই ঘরে শ্বশুরমশাই থাকেন। পাশের ঘরে আমি আর টিনি থাকি। আমার ঘর থেকে ওঁর ঘরে ঢোকা যায়।"

'ভট্‌চাযমশাই কোন ঘরে থাকতেন?'

'ওই যে দেখছেন! শেষদিকের ঘরে।'

ছন্দা একটা ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন, 'টিনি! টিনি!'

কর্নেল বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে চারপাশটা দেখছিলেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনার মেয়ে নীচে স্কিপিং করছে।'

ছন্দা দেখে নিয়ে বললেন, 'দেখছ কাণ্ড? কখন হলঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। দরজা ভেজিয়ে রেখেছে বলে টের পাইনি। আপনারা ভেতরে এসে বসুন।'

কর্নেল বললেন, "বাহ্! টিনি স্কিপিং করতে করতে মজার ছড়া বলছে তো।"

ছড়াটা শুনতে পেলাম—

'নীচে নামো বাঁয়ে ঘোরো।
তবেই তোমার পোয়া বারো॥'···

বিষ্ণুমূর্তি এবং দুই বাহাদুর

আমাদের বসিয়ে রেখে ছন্দা চলে গিয়েছিলেন। এই ঘরটা কিছুটা সাজানো গোছানো। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিতে ছন্দা এবং মৃগেন্দ্রকে দেখতে পেলাম। সম্ভবত বিয়ের পর তোলা ছবি। একটা জানালার পাশে টিনির লেখাপড়ার টেবিল এবং বইখাতা সাজানো। টেবিলে মৃগেন্দ্রের একটা বাঁধানো ছবি রাখা আছে। মৃগেন্দ্র সুদর্শন ছিলেন বলে মনে হল। অবশ্যি রাজবংশধরদের চেহারায় একটা উদ্ধত ধরনের লাবণ্য থাকে দেখেছি। কিংবা এটা আমার মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের চোখের ভুল!

কর্নেল মন্দিরের দিকের জানালায় গিয়ে বাইনোকুলারে কী দেখছিলেন। একটু পরে সেখান থেকে সরে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'মন্দিরের পেছনে পুকুরটা একসময় জলা ছিল। অনেকখানি ভরাট করে বাড়ি উঠেছে। বাকিটাও ভরাট করা হচ্ছে।'

বললাম, 'মন্দিরের ওখানে পুকুর ঘাটে নামার দরজা দেখে এলাম। কেউ ওদিক থেকে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে ফুলগাছের আড়ালে ওত পেতেছিল হয় তো। তারপর যেই ভট্চাযমশাই আছাড় খেয়ে পড়ে গেছেন, অমনি সে—'

'জল্পনা করে লাভ নেই জয়ন্ত!' কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন। 'তবে হ্যাঁ। ছন্দা বলছিল ওই দরজাটা নাকি বহু বছর খোলা হয়নি। তা ঠিক নয়। দরজার সামনে আগাছার জঙ্গলটা লক্ষ্য করেছি। কিছু কিছু ঝোঁপ বেঁকে আছে। সেটা অবিশ্যি নানা কারণেই হতে পারে।'

'কর্নেল! আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। 'কাল ভট্চাযমশাই প্রথমে আপনাকে বলছিলেন ওঁর খট্কা লেগেছে। পরে বললেন, আসল মূর্তিটা উদ্ধার করে দিতে হবে। তার মানে উনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বিষ্ণুমূর্তি নকল!'

কর্নেল হাসলেন, ওঁর খট্কাতে আমারও খট্কা লেগেছিল। যাই হোক, এখন ও সব কথা থাক্।

ছন্দা পাশের ঘরের দরজার পর্দা তুলে ট্রেতে দু পেয়ালা কফি আর এক প্লেট পটাটো চিপ্‌স্ নিয়ে এলেন। আস্তে বললেন, শ্বশুরমশাই আজ সওয়া দশটাতেই

জেগে গেছেন। জিজ্ঞেস করছিলেন, কারা এসেছে? আমি ওঁকে বললাম, দুজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। একটু পরে ওঁদের নিয়ে আসছি। আপনারা কফি খান। আমি গেট বন্ধ করতে ভুলে গেছি। এখনই খাটালের গোরু-মোষ এসে ঢুকে পড়বে।'

ছন্দা ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার মনে পড়ছে, কুমারবাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন, এই বাড়িটা বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। শুধু ওঁদের গৃহদেবতার জন্য তা পারছেন না। গৃহ-দেবতাকে স্থানচ্যুত করা নাকি পাপ।'

'আপনি তো সব কিছুতেই নাক গলান!' হাসতে হাসতে বললাম। 'এই অদ্ভুত মন্দিরের ব্যাপারটা আপনার অজানা থেকে গেছে। আশ্চর্য!'

কর্নেল একটু পরে বললেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি ক্যাক্টাস্ নিয়েই আলোচনা করতে আসতাম। উনি একজন ক্যাক্টাস্ বিশেষজ্ঞ। এই মন্দির সম্পর্কে উনি বিশেষ কিছু বলেননি। তাই আমারও কৌতূহল জাগেনি। তাছাড়া সব অভিজাত বা বনেদি পরিবারেরই ঠাকুরবাড়ি থাকে। কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ ছিল না।'

কিছুক্ষণ পরে ছন্দা ফিরে এলেন। বললেন, এতদিন ভটচায্‌কাকুই শ্বশুর-মশাইকে বাথরুমে নিয়ে যেতেন। দেখতে রোগা মানুষ হলেও ওঁর গায়ে জোর ছিল। দু'হাতে শ্বশুরমশাইকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলতে পারতেন। এমন সমস্যায় পড়া গেছে। টিনিকে দিয়ে জংবাহাদুরকে আবার ডাকতে পাঠালাম। জংবাহাদুর একসময় এ বাড়িতে কাজ করত। ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হয়তো মনে ক্ষোভ আছে। তাই আসছে না। আপনারা প্লিজ্ আর একটু অপেক্ষা করুন।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি বীরেশ্বরবাবুর চিঠিটা কি খুঁজে দেখেছ?'

"ওঃ! একেবারে ভুলে গেছি। আমার মাথার ঠিক নেই। দেখছি।'

"দেখ। ততক্ষণ আমরা নীচে ঘুরে আসি। আর—যদি আপত্তি না থাকে, হলঘর থেকে মন্দিরে ঢোকার চাবিটা দাও। আমি আরেকবার মন্দিরটা দেখতে চাই।"

ছন্দা বলল, ওই দরজা ছাড়াও মন্দিরে যাওয়ার একটা পথ আছে। আসুন দেখাচ্ছি।'

সে আমাদের বারান্দায় নিয়ে গেল। তারপর শেষ একটা লোহার ঘোরালো

সিঁড়ি দেখাল। সিঁড়িটা মরচে ধরা। ধাপগুলো কোনওক্রমে টিকে আছে। সে বলল, 'ভেঙে পড়বে না! তবে সাবধানে একে-একে নামতে হবে। আমি অনেক সময় শর্ট কাটে এদিক থেকেও ঠাকুরবাড়িতে যাই। টিনি তো রোজ যখন-তখন নেমে যায়। অবিশ্যি ওর ওজন আর একজন বয়স্ক মানুষের ওজন—'

কর্নেল হাসলেন। 'আমার ওজন সহ্য করবে কিনা পরীক্ষা করা যাক।'

আমার ভয় করছিল। কিন্তু কর্নেলের সামরিক জীবনের ট্রেনিং আবার কাজে লাগল। দিব্যি নেমে গেলেন। আমি একসময় কর্নেলের তাগিদে কিছুদিন মাউন্টেনিয়ারিঙে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। অনেক কসরত করে নেমে গেলাম। মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণে একটা ঝাঁপালো ছাতিম গাছ আছে। তাছাড়া সিঁড়িটা বাড়ির পশ্চিমদিকে এবং মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক হাত দূরে বলে তখন চোখে পড়েনি।

এবার মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে একটু দুর্ভোগ সইতে হল। ফুলগাছগুলো ঠেলে সরিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হল। বললাম, 'কর্নেল! খুনী এখানেও লুকিয়ে থাকতে পারত। তাই না?'

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'পারত। তবে তা হলে তাকে বাড়ির দোতলায় উঠতে হত।'

কথাটা বলে উনি পুকুর ঘাটের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার সামনেটা আগাছার জঙ্গলে ঢেকে আছে সে-কথা আগেই বলেছি। কর্নেল সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আশ্চর্য তো!'

'কী আশ্চর্য?'

'কিছু ঝোপ বেঁকে গেছে। ওই ঝোপটার ডাল ভেঙে গেছে। টাটকা ভাঙা। অথচ—'

উত্তেজিতভাবে বললাম, 'খুনী তাহলে ওখানেই ওত পেতে ছিল।'

'থাকতে পারে। কিন্তু দরজাটা—আশ্চর্য! দরজার হুড়কো ঠিকভাবে বসানো নেই। কেউ নিশ্চয় খুলেছিল। কিন্তু এত শিগগির কপাটের ওপর মাকড়সা জাল বুনে ফেলল?'

'পোকামাকড় বিষয়ে তো আপনি বিশেষজ্ঞ। বিদেশি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। আমি একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম, মাকড়সার জাল লম্বা করলে নাকি পাঁচশো মাইল হয়। এই জালটা লম্বা করে দেখবেন নাকি?'

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। ঝোপঝাড় ঠেলে কয়েক পা

এগিয়ে গেলেন। তারপর সরে এসে বললেন, 'রাতে এই এলাকায় বৃষ্টি হয়েছিল। মাকড়সা জাল বুনেছে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু বৃষ্টির আগে কেউ ওই দরজাটা খুলেছিল। কেন খুলেছিল বোঝা যাচ্ছে না।'

বললাম, 'কর্নেল! এ সবের চেয়ে বড় প্রশ্ন—আপনাকেই কোট্ করে বলছি, এই খুনের মোটিভ। আপনিই বলেন, মোটিভ খুঁজে পেলেই খুনীকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'তোমার কী ধারণা বলো শুনি?'

'ভটচাযমশাই আপনার বাড়ি থেকে আসার পর হয় তো কে মূর্তিচোর তা জানতে পেরেছিলেন। তাই খুনী তাঁর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।'

'জানতে পারলে ছন্দাকে তিনি নিশ্চয় বলতেন। তাছাড়া তিনি তখনই টেলিফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ছন্দাও যোগাযোগ করতে পারত।'

'ছন্দাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন?'

'বীরেশ্বর সেন নামে ওঁর স্বামীর এক কলিগ ওঁকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা উনি যেন আপনাকে দেখাতে অনিচ্ছুক। ভদ্রলোকের সঙ্গে ছন্দার—'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'শাট আপ!'

অবিশ্যি ওঁর মুখে কৌতুক ঝলমল করছিল। প্যাণ্ট শার্ট থেকে ঝোপের আবর্জনা পরিষ্কার করে টুপি খুললেন কর্নেল। টুপি থেকে একটা পোকা তুলে ঝোঁপে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, 'জয়ন্ত! বীরেশ্বরবাবুর কথা আমরা ছন্দার কাছেই জেনেছি। তবে একটা গুরুত্বপুর্ণ পয়েণ্ট হল, ভটচাযমশাইয়ের অন্তিম মুহূর্তের কথাটা। বীরু!'

এই সময় টিনি ফুলগাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছরের বেশি নয়। সে কর্নেলের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার পর বলল, "তোমার মুখে সাদা দাড়ি কেন?

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'তুমি স্কিপিং করতে করতে ছড়া বলো কেন?'

'দাদু শিখিয়ে দিয়েছেন। বলো না তোমার মুখে সাদা দাঁড়ি কেন?'

'ছড়াটা আবার বলো। তা হলে বলব।'

টিনি আওড়াল—

'নীচে নেমে বামে ঘোরো
তবেই তোমার পোয়াবারো॥'

কর্নেল ওর চিবুকে তর্জনী ছুঁইয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার দাড়ি সাদা কেন, তা যদি তোমাকে বলে দিই, তাহলে তোমার দাদুর দাড়িও সাদা হয়ে যাবে।'

'দাদুর দাড়িই নেই।'

'কেন নেই?'

'দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।'

'তোমার দাদু উঠেছেন?'

'হ্যাঁ। বাহাদুর এসে দাদুকে ওঠাল।'

এই সময় দোতলার একটা জানালা থেকে ছন্দা ডাকলেন, 'টিনি! এখনও কী করছ? ওঁদের ডাকতে পাঠালাম না তোমাকে? সঙ্গে করে নিয়ে এস। নীচের দরজা খুলে দিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠো না যেন।'

টিনি বলল, 'সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলে দাদু রাগ করে। তোমরা এদিকে এস।'

এবার আমরা সেই করিডর দিয়ে হলঘরে ঢুকলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, ছন্দা ওই বিপজ্জনক সিঁড়ি দিয়ে তখন আমাদের যেন নামতে বাধ্য করলেন। কেন?

টিনি হলঘরে গিয়েই দৌড়ে ওপরে চলে গেল। কর্নেলের কাছে চুপিচুপি প্রশ্নটা তুললাম। কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি ছন্দা সম্পর্কে ক্রমশ বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ছ জয়ন্ত!'

'আপনার মতো লম্বাচওড়া ওয়েটি মানুষের ভারে সিঁড়িটা ভেঙে পড়ার চান্স ছিল কিন্তু!'

এবার কর্নেলের মুখে হাসি ফুটল। 'সেটা অবিশ্যি ঠিক।'

'অত উঁচু থেকে পড়লে আপনার কী অবস্থা হত বুঝতে পারছেন?'

'হুঁ। হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে যেতাম।'

'তাহলে?'

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন, 'যাই হোক, ছড়াটার একটা মানে যেন বোঝা যাচ্ছে। দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে বাঁয়ে ঘুরলেই ঠাকুরবাড়ির দরজা। আর ডাইনে ঘুরলে—হ্যাঁ, ওই ছবিটা। গৃহ-দেবতা বিষ্ণুমূর্তির ছবি। দেখতে পাচ্ছ?'

আমরা হলঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। দেখলাম, দেয়ালে চওড়া ফ্রেমে

বাঁধানো একটা বিষ্ণুমূর্তির ফোটো টাঙানো আছে। এই সময় হলঘরের সিঁড়িতে বেঁটে গোলগোল আর শক্তসমর্থ গড়নের প্রৌঢ় একটা লোককে দেখতে পেলাম। তার পরনে খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। সে থমকে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়ে বলল, 'কর্নিলসাব! আপ?'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'চিনতে পেরেছ জঙ্গ্‌বাহাদুর?

'জি হাঁ কর্নিলসাব! আপ এত্তা বরষ বাদ এখানে আসলেন!'

'হ্যাঁ। প্রায় পনের বছর পরে। তা তুমি কেমন আছো বলো?'

'ভালো নেহি আছে কর্নিলসাব! আর এখানে আমার নোকরি নেহি আছে।'

'এসেই সে-খবর পেয়েছি।'

জঙ্গ্‌বাহাদুর একটু হেসে চাপা গলায় বলল, 'ঠাকুরমশাই মার্ডার হইয়ে গেল। পুলিস আসল। আমাকে বহুরানি খবর ভেজেছিল। লেকিন আমি আসিনি। ঠাকুরমোশাই আচ্ছা আদমি ছিল না। উন্‌হি তো আমাকে নোকরি থেকে বরখাস্ত করিয়েছিল।'

'এই ঠাকুরমোশাই কতদিন এ বাড়িতে ছিলেন?'

'তিন বরষ হবে। আগের ঠাকুরমোশাই আচ্ছা আদমি ছিল।' জঙ্গ্‌বাহাদুর ঘুরে ওপরটা দেখে নিয়ে বলল, 'বহুরানি খবর ভেজলেন দুসরাবার। কুমার-সাবভি বললেন, ভুল হইয়ে গেছে। তুম্ ফির কাম করো।'

'হ্যাঁ। তুমি এ বাড়ির পুরনো লোক। তুমি কাজে বহাল হলে কুমার-বাহাদুর আর বউরানির সুবিধা হবে।'

জঙ্গ্‌বাহাদুর মুখে দুঃখের ছাপ ফুটিয়ে বলল, 'কুমারসাবের এত্তা বেমারি হইয়েছে, আমি জানতাম না কর্নিলসাব!'

ওপর থেকে ছন্দা ডাকলেন, 'বাহাদুর! গল্প পরে হবে। ওঁদের আসতে বলো।'

জঙ্গ্‌বাহাদুর আবার সেলাম ঠুকে নীচে কোথাও গেল। আমরা দোতলায় গিয়ে দেখি, ছন্দা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'শ্বশুরমশাইকে আপনার আসার কথা বলেছি। ভেবেছিলাম ভটচাযকাকুর দুঃসংবাদটা আপনার মুখ দিয়েই ওঁকে জানাব। কিন্তু জঙ্গ্‌বাহাদুর জানিয়ে ফেলল।'

কর্নেল বললেন 'ওঁর রিঅ্যাক্‌শন কী?'

'শুনে গুম হয়ে গেলেন। কোনও কথা বললেন না। আপনারা আসুন।'

ছন্দা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা সেকেলে আসবাবে

সাজানো। কয়েকটা আলমারি বইয়ে ভর্তি। সব জানালা বন্ধ। শুধু একটা জানালা খোলা আছে। জানালাটার পাশে একটা প্রকাণ্ড খাট। সেই খাটে কর্নেলের মতোই লম্বাচওড়া একজন বৃদ্ধ কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। ঘরের ভেতর শুধু ওই উত্তরের জানালা দিয়েই যেটুকু আলো আসছে।

খাটের পাশে দুটো চেয়ার আর একটা গোল টেবিল সাজানো আছে। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালেন। 'হ্যালো কুমারবাহাদুর!'

সত্যেন্দ্রনাথের ডান হাতটা একটু উঠেই পড়ে গেল। বাঁ হাত বাড়িয়ে কর্নেলের হাত চেপে ধরলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'আমার বড় দুঃসময়ে আপনাকে পেয়ে মনে ভরসা এল। আপনাকে কতদিন দেখিনি!'

'প্রায় পনের বছর।'

'হবে। বসুন কর্নেলসায়েব!'

'আলাপ করিয়ে দিই। আমার তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।'

সত্যেন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসো বাবা! তুমি বলছি—কিছু মনে কোরো না!'

আমরা বসলাম। কর্নেল বললেন, 'আপনার অসুখ শুনে দুঃখিত কুমারবাহাদুর!'

'আমাকে আর কুমারবাহাদুর বলবেন না প্লিজ!' বউমা! কর্নেলসায়েব কিন্তু কফির ভক্ত।'

'ছন্দা কফি অলরেডি খাইয়েছে। আর কফি খাব না। আপনার এই অসুখ কবে হল?'

'গত মাসে হঠাৎ বাথরুমে পড়ে গেলাম। তারপর ডান হাত থেকে ডান পা অব্দি নিঃসাড়। সম্ভবত প্যারালেসিস। কিন্তু আপনি তো জানেন, জীবনে আমি ওষুধ খাইনি। আমি আমার পূজ্য দেবতা শ্রীবিষ্ণু আর নিজের ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাসী। এ অসুখ শিগগির সেরে যাবে। এই তো আজই মনে হচ্ছে, অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি।'

ছন্দা বললেন, 'আপনারা কথা বলুন। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।'

ছন্দা বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল আস্তে বললেন, 'আপনার গৃহদেবতার মন্দিরে আজ ভোরে একটা মিসহ্যাপ হয়েছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ নির্বিকার মুখে বললেন, 'পাপের শাস্তি ! নরহরি এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে একটার পর একটা—থাক্ ওসব কথা। আপনার খবর বলুন !'

'আমার খবর নতুন কিছু নেই। যথাপূর্বং। সেই পাখিপ্রজাপতি অর্কিড ক্যাকটাস এবং মাঝেমাঝে রহস্যের গন্ধ পেলেই ছুটে বেড়ানো।'

সত্যেন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। 'নরহরি ব্যাটাচ্ছেলের মৃত্যু রহস্যের গন্ধ পেয়েই যদি এখানে এসে থাকেন, তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব, এটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তাছাড়া এতে সত্যি বলতে কী কোনও রহস্যই নেই। পুলিস নরহরির খুনীকে ঠিকই ধরে ফেলবে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'কাল বিকেলে নরহরিবাবু আমার কাছে গিয়েছিলেন।'

'আপনার কাছে ? নরহরি গিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। আপনার গৃহদেবতার আসল মূর্তি নাকি চুরি গেছে। আমাকে তা উদ্ধার করে দিতে হবে।'

সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় গর্জন করলেন, 'চোর ! চোর ! নিজেই চুরি করে বেচে দিয়ে সাধু সাজার জন্য আপনার কাছে গিয়েছিল !'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'উনি বলছিলেন, মন্দিরের তালা খোলার কৌশল শুধু উনি এবং আপনি জানেন ! আর কেউ জানে না। এখন উনি আর বেঁচে নেই। তাই বিষ্ণুমূর্তি সত্যি চুরি গেছে কি না দেখা দরকার।'

সত্যেন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'বউমা !'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছন্দা ঘরে ঢুকলেন। খাটের কাছে এসে বললেন, 'বলুন বাবা !'

'আজ তুমি ভোরে মন্দিরে প্রণাম করতে যাওনি ?'

ছন্দা মুখ নিচু করে বললেন, 'প্রণাম করেছি। তবে মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। ভটচায্ কাকু উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। মাথার পেছনে রক্ত। আপনাকে তো সব বললাম একটু আগে।'

'তা হলে মন্দিরের দরজা খোলা ছিল না ?'

'না।'

'তুমি বাহাদুরকে ডাকো ! আমাকে মন্দিরের দরজায় বসিয়ে রেখে আসবে। সে আমাকে রেখে ফিরে এলে তুমি হলঘরের দরজায় পাহারা দেবে। কেউ তালা খোলার কৌশল যেন না বুঝতে পারে। বুঝেছ ?'

'হ্যাঁ বাবা!'

"যাও! বাহাদুরকে ডেকে আনো!' বলে সত্যেন্দ্রনাথ কর্নেলের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। "সরি কর্নেলসায়েব! আপনার বাইনোকুলার দিয়ে তালা খোলার কৌশল দেখার সুযোগ কিন্তু আপনাকে দিচ্ছি না। আপনারা দুজনে হলঘরে বসে থাকবেন।'

ছন্দা তখনই বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি হলঘরেই বসে থাকব। আমি শুধু জানতে চাই সত্যিই আসল মূর্তি আছে, নাকি নেই।'

"আপনি কি বলতে চাইছেন চোর আসল মূর্তি হাতিয়ে নকল মূর্তি রেখেছে?'

'হ্যাঁ। নরহরিবাবু সেই কথাই বলছিলেন।'

সত্যেন্দ্রনাথ আবার গর্জন করলেন, 'চোর! চোর! নরহরিই চুরি করেছে। তারপর টাকার বখরা নিয়ে স্যাঙাতদের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছে। তখন তারা ওকে খুন করেছে। ওঃ! আমাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা গৃহদেবতা।'

তিনি মুখ ঘুরিয়ে অশ্রু সম্বরণ করলেন। একটু পরে বাহাদুর এসে ওঁকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল। অবাক হয়ে গেলাম! বাহাদুরের গায়ে দেখছি অসম্ভব জোর। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। হলঘরে নেমে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "বউমা! বাহাদুর ফিরে আসার পাঁচ মিনিট পরে আবার যেন আমাকে আনতে যায়। ওই পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট।'

ছন্দা করিডরের দরজার তালা খুলে দিলেন। বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে ঢুকে গেল। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, ছন্দাকে বলি, নরহরি ভট্টাচার্য কর্নেলকে মিথ্যা করে বলেছিলেন, উনি নাকি পঁয়ত্রিশ বছর এই মন্দিরের সেবাইত। কেন উনি মিথ্যা বলছিলেন?

কিন্তু কর্নেল দেয়ালে টাঙানো বিষ্ণুমূর্তির ছবি দেখছেন এবং ছন্দা তাঁর কাছে গিয়ে চুপিচুপি কী যেন বলছেন। তাই কথাটা বলার সুযোগ পেলাম না।

বাহাদুর ফিরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বাহাদুর! এবার তোমার কুমারসাহেবকে নিয়ে এস।'

সত্যেন্দ্রনাথ বাহাদুরের কোলে চেপে এসে বাঁকা হেসে বললেন, 'নরহরি শুধু চোর নয়, মিথ্যুক। মূর্তি চুরি যায়নি। আসল মূর্তিই আছে। কর্নেলসায়েব! এবার

আসুন ! গল্প করা যাক। এই বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। বরং এই মজাটা উপভোগ্য—এক বাহাদুর আর এক বাহাদুরকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই না ?'…

বীরেশ্বর এবং ঝুলির বেড়াল

কুমারবাহাদুরের কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল যখন বেরুলেন, তখন প্রায় সওয়া বারোটা বাজে। ছন্দা আমাদের সঙ্গে হলঘরের দরজা অব্দি এলেন। বললেন, 'শ্বশুরমশাই বলছেন আসল মূর্তিই আছে। অথচ ভটচাযকাকু বলেছিলেন, বিষ্ণুমূর্তি বদলে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল বললেন, 'তুমি তো বিয়ের পর থেকে গৃহদেবতাকে প্রণাম করতে যাও ! তুমি কি মূর্তির কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করোনি ?'

ছন্দা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'অত কিছু লক্ষ্য করিনি। আমি মন্দিরের বারান্দা থেকে প্রণাম করে চলে আসি। কারণ মন্দিরের তালা খোলা এবং বন্ধ করার সময় কারও ওখানে থাকা বারণ। তবে—'

'তবে কী ?'

'কিছুদিন আগে ভটচাযকাকু বিষ্ণুমূর্তির রঙ বদল এবং বুকের কাছে রেখা ফুটে ওঠার কথা বলেছিলেন। তাই ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করেছিলাম। মন্দিরের ভেতর ইলেকট্রিক আলো জ্বালানোর নিয়ম নেই। ভোরে এবং সন্ধ্যায় দুবার পুজোর সময় প্রদীপ জ্বালানো হয়। পরশু আর কাল ভোরে প্রণামের পর বুকের কাছে একটা সূক্ষ্ম রেখা চোখে পড়েছিল। রঙটাও একটু তামাটে দেখাচ্ছিল। অবিশ্যি আমার চোখের ভুলও হতে পারে।'

'জোর দিয়ে বলতে পারছ না তা হলে ?'

ছন্দা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, 'রেখাটা হয়তো দেখেছিলাম।'

'তোমাদের হলঘরে শ্রীবিষ্ণুর যে ফোটো আছে, তাতে বুকের কাছে কোনও রেখা নেই।'

ছন্দা চমকে উঠলেন। তারপর আস্তে বললেন, 'ভটচাযকাকুকে মিথ্যাবাদী ভাবতে পারছি না।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "তুমি বীরেশ্বরবাবুর চিঠিটা খুঁজে পেলে ওঁর ঠিকানাটা ফোনে আমাকে জানিয়ে দিয়ো। আর একটা কথা। তোমার শ্বশুর-

মশাই বীরেশ্বরবাবুকে চেনেন। তাঁর সুপারিশেই উনি ভটচাযমশাইকে সেবাইত নিযুক্ত করেছিলেন। তুমি জানতে এ কথা?'

'না তো! ছন্দা অবাক হয়ে গেলেন।' টিনির বাবাও আমাকে কিছু বলেনি।'

তোমার বিয়ে হয়েছে দশ বছর আগে। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে তা জেনেছি। কিন্তু তখন যে সেবাইত ছিলেন, কেন তাঁর চাকরি গিয়েছিল এবং তিনি এখন কোথায় আছেন, এসব কথা উনি বলতে চাইলেন না। তুমি এ বিষয়ে কিছু জানো?'

ছন্দা আবার চমকে উঠলেন। 'তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন।'

'তার নাম কী?'

'জয়রাম শর্মা বলেই তাঁকে জানতাম। রাত্রে তিনি মদ খেয়ে মাতলামি করতেন। শ্বশুরমশাই তাঁকে মারধর করেছিলেন। তারপর তিনি নিখোঁজ হন।'

'জয়রাম শর্মা তাহলে মন্দিরের তালা খোলার কৌশল জানতেন!'

'হ্যাঁ। জানতেন। না জানলে পুজো করবেন কী ভাবে?'

'কিন্তু তিনি নিখোঁজ হলে তোমার শ্বশুরমশাই কি তালার কোনও রদবদল করেছিলেন?'

'টিনির বাবার কাছে শুনেছি, তালার নাম্বার সিস্টেম বদলানো হয়েছে।'

'কে বদলেছিলেন জানো না?'

'সঠিক জানি না। তবে শ্বশুরমশাই নাকি নাম্বার সিস্টেম বদলাতে জানেন। কাজেই উনি ছাড়া আর কে বদলাবেন?'

'ঠিক আছে চলি।'

কর্নেলকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ই. এম. বাইপাশের মোড়ে ট্রাফিক-সিগন্যালের জন্য গাড়ি দাঁড় করাতেই উনি হঠাৎ নেমে গেলেন এবং অবাক হয়ে দেখলাম, একটা খালি ট্যাক্সিও পেয়ে গেলেন। হয়তো ওঁর সাদা দাড়ি দেখেই ট্যাক্সিচালকরা ওঁকে না করতে পারেন না। কিংবা উনি ট্যাক্সিচালকদের বশীভূত করার মন্ত্র-টন্ত্র জানেন। বরাবর এই ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়। অবিশ্যি মোহনপুর প্যালেসে ছোট্ট মেয়ে টিনি কর্নেলের সাদা দাড়ির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল!....

সেদিনই সন্ধ্যায় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে কর্নেলের টেলিফোন এল। 'জয়ন্ত! বাড়ি ফেরার পথে একবার দেখা করে যেও। ডিনার খাওয়া না-খাওয়া তোমার ইচ্ছা। তবে ইউ মে বি ইন্টারেস্টেড্!

উত্তেজিতভাবে বললাম, 'আবার কি কিছু ঘটেছে ?'

'তেমন কিছু ঘটেনি। ফোনে হুমকি দেওয়াটা নতুন নয়।'

'তার মানে আজ আবার আপনাকে ফোনে কেউ হুমকি দিয়েছে !'

'হুমকির চেয়ে মজার কথা, ষষ্ঠী মিসেস অ্যারাথুনের বেড়ালটাকে খুব জব্দ করেছে।'

হেসে ফেললাম। 'ওঃ কর্নেল! বেড়ালের ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট্ নেই।'

'বেড়ালকে অনেকেই অপছন্দ করে। কারণ এই খুদে চতুষ্পদ প্রাণীটি মাছ-মাংস-দুধের লোভে গোপনে হানা দেয়। কাজেই দুধের গ্লাস সাবাড় করতে এসে তা উল্টে গেলে মোহনপুর প্যালেসের একটা বেড়ালও জব্দ হতে পারে।'

কর্নেল কথাগুলো বলেই ফোন রেখে দিলেন। পিঁ পিঁ শব্দ শুনতে পেলাম। কর্নেলের হেঁয়ালি করার অভ্যাস আছে। কিন্তু মোহনপুর প্যালেসের বেড়াল জব্দ হওয়াটা হেঁয়ালি হলেও অর্থবহ। চৌরঙ্গি এলাকার একটা হোটেলে ডাকাতির খবরটা লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার-সূত্রে টেলিফোনে জেনে নিয়েছিলাম। সেই খবর লেখা শেষ করেই বেরিয়ে পড়লাম। ইলিয়ট রোডে যখন পৌঁছুলাম, তখন প্রায় পৌনে আটটা বাজে।

তিনতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি, উনি ড্রয়িংরুমে যথারীতি চুরুট কামড়ে ধরে টেবিলে ঝুঁকে আছেন এবং একটা কাগজে কী সব লেখালিখি করছেন। আমাকে দেখে মুখ তুলে সহাস্যে বললেন, 'বেড়াল ইন্টারেস্টিং প্রাণী। তবে আগে কফি খাও। কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। ষষ্ঠী! কফি নিয়ে আয় শিগগির!'

সোফায় বসে বললাম, 'মোহনপুর প্যালেসে বেড়াল জব্দ হওয়ার ব্যাপারটা আগে বলুন!'

'বলছি। আগে কফি।'

ষষ্ঠী কফি নিয়ে এল। সে একগাল হেসে বলল, 'আজ পাজি বেড়ালটার লেজ ধরে ফেলেছিলাম দাদাবাবু! কিন্তু হাত ফসকে পালিয়ে গেলে কী হবে? খুব জব্দ হয়েছে। আর ভুলেও উঁকি দিতে আসবে না।'

সে বেরিয়ে গেলে কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'মিসেস অ্যারাথুনের বেড়াল আর মোহনপুর প্যালেসের বেড়ালের মধ্যে বুদ্ধির তফাত আছে। ওই বেড়ালটা অবিশ্যি লেজ ধরতে দেয়নি। কিন্তু বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে।'

'প্লিজ কর্নেল ! হেঁয়ালি সোনার মুড নেই।'

কর্নেল এবার একটু গম্ভীর হলেন। 'বিকেলে ছন্দা ফোন করেছিল। তার শ্বশুরমশাই সন্ধ্যার আগে এক গ্লাস দুধ খান। দুধটা সে খাটের পাশে টেবিলে রেখে এসেছিল। একটু পরে গিয়ে সে অবাক হয়ে দেখেছে, দুধের গ্লাস উল্টে মেঝেতে পড়ে আছে এবং তার শ্বশুরমশাই রাগে ফুঁসছেন। কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে তাঁর দুধের গ্লাস উল্টে ফেলেছে। তাঁর ডান হাত অকেজো। বাঁ হাতে খপ করে বেড়ালটা ধরে রাগের চোটে তিনি আছাড় মেরেছেন। আছাড় খেয়েই বেড়ালটা মারা পড়েছে।'

আমার উৎসাহ মিইয়ে গেল। বললাম, 'এটা কী এমন ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার ! ওঁকে দেখেই তো মনে হচ্ছিল খুব রাগী আর গোঁয়ার মানুষ।'

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। রাগী আর গোঁয়ার মানুষ তো বটেই। কিন্তু না এইজন্য তোমাকে আসতে বলিনি। ছন্দা বলল, আজ সকালের ফ্লাইটে বীরেশ্বর সেন কলকাতা এসেছেন। তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন। ছন্দা তাঁকে নরহরি ভট্টাচার্য খুন হওয়ার কথা জানিয়েছে, আমার কথাও বলেছে, আমার ফোন নাম্বার দিয়েছে। বীরেশ্বরবাবু কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে আমার কাছে আসছেন।'

শোনামাত্র উৎসাহটা ফিরে এল। বললাম, 'হ্যাঁ। তাহলে ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার।'

কর্নেল হাসলেন। 'তার চেয়েও ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার, মৃগেন্দ্র এবং বীরেশ্বর যে কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সেটা একটা অকশন কোম্পানি। নানা দেশে এই কোম্পানির ব্রাঞ্চ আছে। প্রাচীন অভিজাত ধনী পরিবারের মূল্যবান জিনিসপত্র বা ধনরত্ন কিনে নিলামে বিক্রি করেন ওঁরা। কুমারবাহাদুরের কাছে এই কোম্পানির নাম আজ তুমিও শুনেছিলে !'

'শুনেছিলাম মনে পড়ছে। কী যেন নামটা—'

'জয় ট্রেডার্স। নাম শুনে কিছু বোঝা যায় না। আমি আজ লাঞ্চের পর টেলিফোন গাইড দেখে ওঁদের টেলিফোন করেছিলাম। একটা পার্সোনাল কম্পিউটার কেনার ছল করতে হয়েছিল। তো ওঁরা জানিয়ে ছিলেন ওখানে কম্পিউটার বিক্রি হয় না। ওটা একটা নিলামসংস্থা।'

'তাহলে রহস্য ঘনীভূত বলা চলে !'

কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন। 'ঘনীভূত তো বটেই ! বরফের মতো ঘনীভূত।'

'তার মানে?'

'জল জমে ঘন হলে বরফ বলা হয়। বরফে ভাপ ওঠে। খুব ভাপ উঠছে।'

'ওঃ কর্নেল! আপনি রসিকতা করছেন।'

কর্নেল কফি শেষ করার পর চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'রসিকতা কী বলছ ডার্লিং! ফোনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলে গাল দিল কেউ। তারপর বলল, সাবধান! ফাঁদ পাতা আছে। ওই যে কথায় বলে, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি!'

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। 'হ্যাঁ। বলুন মিঃ নন্দী!...মর্গের রিপোর্টে তা-ই বলেছে নাকি? ধন্যবাদ।...অ্যাঁ! বলেন কী?...তাহলে আপনাদের থিওরি কারেক্ট। হ্যাঁ—সাট্টাডন লোকটার ফোন নাম্বার দিতে অসুবিধে আছে? ...এক মিনিট।' বলে কর্নেল টেবিলে রাখা প্যাডের পাতা ওল্টালেন। কলম বাগিয়ে ধরলেন। 'বলুন মিঃ নন্দী!... অসংখ্য ধন্যবাদ। রাখছি।'

ফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার কৌতূহল স্বাভাবিক। দমদম নর্থ রেঞ্জের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সুমন নন্দীকে তোমার অবশ্যি চেনা উচিত।'

'নাম শুনেছি।'

'ওই এলাকার সব সাট্টাবাজের খবর ওঁর নখদর্পণে।'

কর্নেলের কথার ওপর বললাম, ''নরহরি ভটচায সাট্টা খেলতেন নাকি?'

কর্নেল জিভ কেটে বললেন, 'না, না! উনি সাট্টা খেলতেন না। ওই এলাকার এক সাট্টাডন হাজারিলাল আজ কথা প্রসঙ্গে মিঃ নন্দীকে জানিয়েছে, সে মোহনপুর প্যালেস কেনার জন্য কুমারবাহাদুরের সঙ্গে অনেকদিন ধরে কথাবার্তা চালিয়ে আসছে কুমারবাহাদুর বিক্রি করতে রাজি। কিন্তু হাজারিলালের কট্টর শত্রু জনৈক দুর্গাপ্রসাদ সিংহের সাহায্যে নাকি নরহরিবাবুই বাগড়া দিচ্ছিলেন। কুমারবাহাদুর এই দুর্গাদাসের কাছে বহু টাকা ধার করেছেন। এখন হাজারিলাল খুব খুশি। নরহরিবাবু মারা পড়েছেন। মোহনপুর প্যালেস গোপনে কিনে ফেলতে আর অসুবিধে নেই। দুর্গাদাসকে আর কে খবর দেবে যে, কুমারবাহাদুর বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছেন? যখন দুর্গাদাস সে খবর পাবে, তখন কুমারবাহাদুর তার দেনা শোধ করে দেবেন! হাজারিলালের যুক্তিটা হল এই।'

'পুলিস তাহলে হাজারিলালকে ধরছে না কেন? নরহরিবাবুকে খুন করার

মোটিভ তো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'হাজারিলালকে ধরা শক্ত। তার মুরুব্বির জোর আছে। তাছাড়া সে নিজে বা তার লোক দিয়ে নরহরিবাবুকে খুন করেছে, তার প্রমাণ পুলিস পায়নি। শুধু অনুমানের ভিত্তিতে এসব লোককে ধরা যায় না।'

'মর্গের রিপোর্টের কথা বলছিলেন। ওতে কী বলা হয়েছে?'

'কোনও ভোঁতা আর শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। মাথার পেছন দিকে একটা বিশেষ জায়গায় আঘাত করলে মৃত্যু অনিবার্য।'

কর্নেল এবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। আমি একটা বিদেশী পত্রিকা তুলে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। বীরেশ্বর সেনের প্রতীক্ষা করতে করতে যেন সারা জীবন কেটে যাবে।

বীরেশ্বর এলেন সওয়া আটটায়। বেশ স্বাস্থ্যবান এবং স্মার্ট ঝকমকে চেহারা। পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি একটু গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি আপনার কাছে এসব ব্যাপারে আসতাম না কর্নেল সরকার! কিন্তু নরহরিকাকু মৃত্যুর সময় নাকি আমার ডাকনাম উচ্চারণ করেছিলেন। এটাই আশ্চর্য লেগেছে। ছন্দার মুখে একথা শোনার পর আমার মনে হল, আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত।'

কর্নেল ষষ্ঠীকে ডেকে কফির হুকুম দিয়ে বললেন, 'আগের ঠাকুরমশাই জয়রাম শর্মা নিখোঁজ হওয়ার পর আপনার সুপারিশেই নাকি নরহরিবাবুকে সেবাইত করা হয়েছিল?'

বীরেশ্বর একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'মৃগেন আমার কলিগ এবং বন্ধু ছিল। সে-ই আমাকে একজন বিশ্বস্ত সেবাইত যোগাড় করে দিতে বলেছিল। তো নরহরিবাবু আমার ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে গৃহদেবতার পুজোর জন্য আসতেন। ওঁর এটাই ছিল একমাত্র জীবিকা। অনেক বাড়িতে পুজো করে বেড়াতেন। কাজেই মৃগেনকে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। মৃগেন ওঁকে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মৃগেনের বাবাকে আমি জ্যাঠামশাই বলি। উনি খুব বুদ্ধিমান এবং সতর্ক মানুষ। কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হয়ে তবে উনি নরহরিবাবুকে কাজে বহাল করেছিলেন।'

'মোহনপুর প্যালেসে রাজমন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি নিশ্চয় আপনি দেখেছেন?'

'ওঁদের নিয়মকানুন বড্ড কড়া। একবার মাত্র দেখেছিলাম। সে-ও সন্ধ্যা-বেলায় বাইরে থেকে দেখা। প্রদীপ জ্বলছিল ভেতরে।'

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া হাত দিয়ে সরিয়ে আস্তে বললেন, 'ছ ইঞ্চি উঁচু মূর্তিটা নিরেট সোনার। ওজন প্রায় এক কিলোগ্রাম। চোখের তারায় দুটো পদ্মরাগ মণি বসানো আছে।'

'আমি অতকিছু লক্ষ্য করিনি। আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ। অষ্টধাতুর বিগ্রহ।'

'মন্দিরের কপাট এবং তালা কি দেখেছেন?'

'নাহ্। তবে মনে হয়েছিল, দরজার দুই পাশে কপাট দুটো ঢুকে গেছে। লিফ্‌টের দরজার মতো। আমি প্রণাম করেই মৃগেনের সঙ্গে চলে এসেছিলাম।'

'কোন পথে?'

বীরেশ্বর তাকালেন। একটু পরে বললেন, 'কেন? হলঘর থেকে যে পথে মন্দিরে যাওয়া যায়!'

'দোতলার পশ্চিমপ্রান্তে একটা লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমেও মন্দিরে যাওয়া যায়। ওটা দেখেছেন কি?'

'সিঁড়িটা দেখেছি। তবে পুরনো মরচে ধরা লোহার সিঁড়ি। আমি জানতাম না ওই সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে যাওয়া যায়। আপনার কাছেই প্রথম শুনছি।'

'আপনি কি আপনার কোম্পানির কাজেই আমেরিকায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমাকে নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চে বদলি করা হয়েছিল। আবার কলকাতা হেড অফিসে ফিরে আসার অর্ডার গেল। তাই চলে এলাম।'

ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। বীরেশ্বর মার্কিনদের মতো শুধু লিকার ঢেলে নিলেন কাপে। কর্নেল বললেন 'আপনাদের কোম্পানি জয় ট্রেডার্স নিলামে পুরনো দামী জিনিস বিক্রি করে।'

বীরেশ্বরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল হঠাৎ। গলার ভেতর বললেন, 'সো হোয়াট?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'আমি আপনার সহযোগিতা চাই।'

'বাট হোয়াই আর ইউ—' বীরেশ্বর থেমে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'সরি! ইউ মে অ্যাস্ক মি এনি ড্যাম্ কোয়েশ্চন ইউ লাইক।'

'অন্তিম মুহূর্তে নরহরিবাবুর বীরু বলার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?'

বীরেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, 'মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমাকে নরহরিবাবু বীরু বলে ডাকতেন তা ঠিক। কিন্তু কেন উনি মৃত্যুর আগে বীরু বলেছেন,

এটা আমারও প্রশ্ন।'

'কুমারবাহাদুর পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী। তিনি—'

'ছন্দা ফোনে আমাকে বলেছে। আমি দেখা করতে যাব।'

'তিনি আজ একটা বেড়ালকে এক আছাড়ে মেরে ফেলেছেন।'

বীরেশ্বর আবার চটে গেলেন। 'হোয়াই আর ইউ প্রেয়িং জোক্স কর্নেল সরকার?'

'নো জোক মিঃ সেন! এ একটা ঘটনা।' কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় বাংলা প্রবচনটা জানেন, বেড়ালের নটা প্রাণ। অথচ এক আছাড়েই একটা বেড়াল মরে গেল। তার অপরাধ, সে কুমারবাহাদুরের দুধের গ্লাস উল্টে দিয়েছিল।'

'আপনি দেখেছেন?'

'না। ছন্দা টেলিফোন জানিয়েছে।'

'ছন্দার একটা বদ অভ্যাস আছে। খুব রঙ চড়িয়ে কথা বলে। আপনি গিয়ে হয়তো দেখবেন ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটেছে।'

'ছন্দাকে আপনি আমেরিকা থেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন!'

'সো হোয়াট?' বীরেশ্বর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'মৃগেনের ক্যান্সারে মৃত্যুর খবর ছন্দা দেয়নি। দৈবাৎ একজনের কাছে জানতে পেরে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম।'

'চিঠিটা ছন্দা খুঁজে পাচ্ছে না।'

'খুঁজে পাচ্ছে না তো আমি কী করতে পারি বলুন? চিঠিটা গোপনীয় ছিল না।'

'আচ্ছা মিঃ সেন, দুর্গাপ্রসাদ সিংহকে আপনি নিশ্চয় চেনেন?'

বীরেশ্বর কর্নেলের দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন, 'চিনি না বললে মিথ্যা বলা হবে। মৃগেনের বাবার বন্ধু উনি। বিগ বিজনেসম্যান। ওঁর বাড়ি বিহারের মোহনপুরে। সেখানে মৃগেনের পূর্বপুরুষের জমিদারি এস্টেট ছিল। কাজেই তাঁকে মৃগেনদের ফ্যামিলিফ্রেণ্ড বলা চলে। মৃগেনই ও-বাড়িতে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনি কেন এসব প্রশ্ন করছেন জানতে পারি কি?'

'নরহরিবাবুর হত্যারহস্য ফাঁস করতে চাই আমি। ছন্দার কাছে তো শুনেছেন, এটা আমার একটা হবি।'

"আমিও চাই খুনী ধরা পড়ুক। নরহরিবাবু সৎ মানুষ ছিলেন। এমনও হতে পারে, অন্তিম মুহূর্তে তিনি আমাকে খবর দিতেই বলেছিলেন। কারণ আমিই তাঁকে সো-কল্ড রাজবাড়িতে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আপনি কি জানেন আগের সেবাইত জয়রাম শর্মা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান?'

বীরেশ্বর মুখ নামিয়ে বললেন, 'পরে মৃগেন এ কথা বলেছিল। আগে জানলে আমি কখনও নরহরিবাবুকে ওদের বাড়িতে সেবাইতের কাজের জন্য সুপারিশ করতাম না। ওই সব তথাকথিত রাজপরিবারে ড্রাকুলার আস্তানা আছে।'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'একটা প্রব্লেম হল, নরহরিবাবুর থাকার ঘর সার্চ করে পুলিস আপনার একটা চিঠি পেয়েছে। চিঠিতে আপনি তাঁকে দুর্গাপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন।'

বীরেশ্বর চমকে উঠেছিলেন। একটু নার্ভাস হয়ে বললেন, "মৃগেনদের বাড়ির একটা অংশ কারা জবরদখল করতে চেয়েছিল। নরহরিবাবু বাধা দেওয়ায় তারা তাঁকে হুমকি দিয়েছিল। তাই আমি দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম।'

'চিঠিতে এসব কথা নেই।'

'নেই মানে—খুব তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা লিখেছিলাম।'

'এনিওয়ে! এতে বোঝা যাচ্ছে আপনাকে নরহরিবাবু চিঠি লিখতেন!'

'ওই একবার লিখেছিলেন। ছন্দার এটা জানা উচিত।'

'ছন্দা জানে না।'

'নিশ্চয় ছন্দা ভুলে গেছে। ওর এই একটা বদ্ অভ্যাস। আপনাকে অলরেডি তা বলেছি।' বীরেশ্বর ঘড়ি দেখে ফের বললেন, 'এই তুচ্ছ কারণে পুলিস আমাকে অ্যারেস্ট্ করে তো করুক। আই হ্যাভ গ্যাট্‌স্ টু কেস এনি ড্যাম সিচুয়েশন। আচ্ছা! আমি উঠছি।'

বলে উনি সটান উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সৌজন্যসূচক কোনও বিদায় সম্ভাষণও করলেন না।

বললাম, "একটা বেড়াল মারা পড়লেও ঝুলির ভেতর থেকে অনেক বেড়াল বেরিয়ে এল দেখছি!"

কর্নেল হাসলেন। "আর একটা মজার বেড়াল তোমাকে দেখাই। বীরেশ্বর সেন আজ মর্নিংয়ের ফ্লাইটে আসেননি। এসেছেন গতকাল বিকেলের ফ্লাইটে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এ খবর যোগাড় করেছি।…'

চিচিং ফাঁক এবং বীরু

রাত সাড়ে নটা বাজে। আমি বাড়ি ফেরার জন্য উঠব ভাবছি, কর্নেল বললেন, "এবার সাট্টাডন হাজারিলালকে নাড়া দিয়ে দেখা যাক কিছু বেরোয় নাকি।"

বলে টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনি ডায়াল করলেন। একটু পরে সাড়া পেয়ে বললেন, "নমস্তে হাজারিলালজি! আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।…আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।…আপনার এই প্রাইভেট নাম্বার আমি কুমারবাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরির কাছে পেয়েছি।…না, না! আমি রিয়েল এস্টেট বিজনেস করি। তো শুনলাম আপনি কুমারবাহাদুরকে ছ-লাখ টাকায়…তাহলে ভুল শুনেছি। ন' লাখই হবে।…না! আপনি শুনুন! দুর্গাপ্রসাদ সিংহের কাছে শুনেছি, মোহনপুর প্যালেস তাঁর কাছে নাকি বন্ধক দেওয়া আছে…নেই? আপনি ঠিক জানেন?…হুঁ। বুঝেছি। তো আজ বীরেশ্বর সেন নামে এক ভদ্রলোক…না। বীরেশ্বরবাবু শুধু মন্দিরের অংশটা কিনতে চান।…সে কী! তাহলে ভদ্রলোক আমাকে মিথ্যা করে…কিন্তু ওঁর উদ্দেশ্য কী?…আপনি আসতে চান তো আসুন! কাল সকাল নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে…হ্যাঁ। ঠিকানা লিখে নিন।'

কর্নেলের কথাবার্তা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু আশঙ্কাও জাগল। একজন সাট্টাডনকে বাড়িতে আসতে বলছেন। তার ওপর এইসব মিথ্যা কথাবার্তা।

ঠিকানা বলে টেলিফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। মুখে মিটিমিটি হাসি।

বললাম, 'এ এক সাংঘাতিক খেলা কর্নেল। ওই লোকটাই যে আপনাকে ফোনে হুমকি দিচ্ছে না আপনি কি জানেন?'

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বীরেশ্বর সেনকে হাজারিলাল চেনে। কিন্তু সে বলল, বীরেশ্বর তার কট্টর শত্রু দুর্গাপ্রসাদের লোক। সে আমাকে বীরেশ্বর সম্পর্কে কিছু গোপন কথা জানাতে চায়। সেকথা টেলিফোনে নাকি বলা যাবে না। মুখোমুখি বলবে।'

'কিন্তু—'

'না কিন্তু! তুমি আরও ঝুলির বেড়াল দেখতে চাইলে কাল সকাল নটার আগেই চলে এস!'…

উত্তেজনায় সে-রাতে ভাল ঘুম হল না। টেবিল ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। সাড়ে সাতটায় উঠে আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরুলাম। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখি, তখনও উনি ছাদে ওঁর বাগানের পরিচর্যা করছেন। বাগানে যত রাজ্যের অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্যাকটাস, অর্কিড আর নানা রকম উদ্ভিদ। এককোণে প্রজাপতিদের জন্য ছোট্ট কাচঘর। ডিম থেকে তিনটি পর্যায়ে বিবর্তনের পর রঙবেরঙের প্রজাপতি জন্মায়। সে এক বিচিত্র জগৎ।

উঁকি মেরে দেখলাম বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ গার্ডেনিংয়ের পোশাক পরে হাঁটু দুমড়ে একটা টবের কাছে বসে আছেন। টবে একটা অষ্টাবক্র ক্যাকটাস। এ সময় আমাকে দেখলেই ওঁর জ্ঞান বিবরণ শুরু হয়ে যাবে। তাই নেমে এসে ড্রয়িং রুমে বসলাম। ষষ্ঠীচরণ বলল, 'দাদাবাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেরেক্‌-ফাস্টো হয় নি।'

বললাম, 'না ষষ্ঠী! আমি বেরেক্‌ফাস্টো করেই বেরিয়েছি।'

ষষ্ঠী হাসল। 'ব্রেকফাস্ট! বাবামশাই আমাকে ভেংচি কেটে বেরেক্‌ফাস্টো বলেন কিনা! তাই বাবামশাইকে ভেংচি কাটলাম।'

বলেই সে দ্রুত পর্দা তুলে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন। সিঁড়িটা এই ড্রয়িং রুমের শেষপ্রান্ত থেকে চিলেকোঠায় উঠে গেছে।

কর্নেল আমার দিকে না তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে পর্দা তুলে ভেতরে গেলেন। মিনিট দশেক পরে সেজেগুজে ঝকঝকে চেহারায় বেরিয়ে এলেন। বললাম, 'আজ মর্নিং সম্ভাষণ করলেন না যে?'

কর্নেল বললেন, 'তুমি যখন আমার শূন্যোদ্যানে উঁকি দিচ্ছিলে, তখনই করেছি। তুমি শুনতে পাওনি!'

'আপনি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিলেন!'

'আমার পেছনেও চোখ আছে ডার্লিং!'

'অসম্ভব!'

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'আমার কান-দুটোই পেছনের চোখ। তুমি জানো, যৌবনে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেওয়ার সময় আমার কান দুটো খুব প্রখর করতে হয়েছিল। কোনদিকে কী শব্দ হল, তা কিসের শব্দ এবং আমার কাছ থেকে

তার দূরত্ব কত, এইসব শিখতে হত। যাইহোক, ষষ্ঠী ঠিকই বলছিল, তোমার বেরেকফাস্টো হয়নি। মানে, ঠিকভাবে হয়নি। এখন সাড়ে আটটা বাজে। আমি রোজ নটায় ব্রেকফাস্ট করি। আজ এখনই সেরে নিতে হবে। কারণ নটার পর যে-কোনও সময় হাজারিলালের আবির্ভাব ঘটবে।'…

হাজারিলাল এল পৌনে দশটায়। তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। 'সাট্টাডন' আজকাল একটা সাংঘাতিক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের কয়েকজনকে আমার পেশার সুবাদে না দেখেছি এমন নয়। কিন্তু হাজারিলাল একে তো বয়সে তরুণ, তার ওপর রোগা টিঙটিঙে। পরনে যেমন—তেমন প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট। মাথার চুলে সামান্য কেতা আছে। গায়ের রঙ কালো। চেহারায় অমায়িক হাবভাব। রাস্তাঘাটে এ ধরনের যুবক সর্বত্র দেখা যায়। ভিড় থেকে এদের আলাদা করে চেনা যায় না।

সে কর্নেলকে নমস্কার করে বিনীত ভাবে বসল। কর্নেল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সে আমার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

কর্নেল তাকে কফি খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে করযোড়ে বলল, 'আমি বাইরে কিছু খাই না।'

তার কথায় এতটুকু অবাঙালি টোন নেই। কর্নেল বললেন, 'বলুন হাজারিলালজি! জয়ন্তের কাছে আমার কিছু লুকোনো থাকে না। তা ছাড়া আপনাকে কথা দিচ্ছি, খবরের কাগজে আপনার কোনও কথা ফাঁস করা হবে না।'

হাজারিলাল বলল, 'দেখুন কর্নেল সরকার। আপনার পরিচয় আমি রাতেই পেয়ে গেছি। সব মহলে আমার চেনা-জানা লোক আছে। অন্য কেউ আমার সঙ্গে এভাবে জোক করলে আমি সহ্য করতাম না। কিন্তু আপনার মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের দরকার আছে বলেই—'

কর্নেল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি ডিটেকটিভ নই। কথাটা আমার পছন্দ নয়। কারণ টিকটিকি কথাটা ডিটেকটিভের স্ল্যাং!'

আমাকে আরও অবাক করে হাজারিলাল বলল, 'বাট আই নিউ ইওর হেল্প কর্নেল সরকার!'

'বলুন কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

হাজারিলাল একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'লোকে আমাকে সাট্টাডন বলে। ঠিক আছে। আমি সাট্টা-জুয়ার কারবারি। এ কারবার খারাপ না ভালো তা নিয়ে আমি ভাবি না। বেঁচে থাকতে হলে টাকা কামাতে হয়। যে যে-ভাবে

পারে, টাকা কামায়। তো দুর্গাপ্রসাদও কামায়। বাট ডু ইউ নো হাউ হি আর্নস্ এ লট অব মানি? সে দেশের ঠাকুরদেবতাকে ফরেনে স্মাগ্‌ল্ করে।' হাজারিলাল দু হাত কপালে রেখে ঠাকুরদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করল। 'এবার বলুন কে বেশি পাপী? আমি, না দুর্গাপ্রসাদ?'

বুঝলাম সে খুব ধর্মবিশ্বাসী। কর্নেল বললেন, 'দুর্গাপ্রসাদ বেশি পাপী।'

হাজারিলাল বলল, 'আমি সাট্টা-জুয়ার কারবারী। প্রফিটের টাকায় আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। খেলার ক্লাব, মেডিক্যাল ইউনিট, মন্দির, আশ্রয় সব কিছুতে আমি টাকা দিই। লোকের হাউজিং প্রব্লেম আছে। তার জন্যই মোহনপুর প্যালেস কিনে আমি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করতে চেয়েছি। এ কি আমার দোষ?'

'কখনই না।'

'তো মোহনপুর প্যালেসের মন্দিরে সোনার দেবতা আছেন। দুর্গাপ্রসাদ অনেক বছর থেকে সেই দেবতাকে চুরি করে ফরেনে স্মাগ্‌ল্ করার চেষ্টায় আছে। তার সঙ্গে একটা কোম্পানির কণ্ট্যাক্ট্ আছে।'

'জয় ট্রেডার্স?'

হাজারিলাল তাকাল। 'দেন ইউ নো ইট!'

'হ্যাঁ। এবার বীরেশ্বরবাবুর কথা বলুন।'

'বীরেশ্বর দুর্গাপ্রসাদের কনট্যাক্ট্ম্যান। সে নরহরি ঠাকুরমশাইকে দিয়ে মোহনপুর প্যালেসের মন্দির থেকে দেবতা চুরির ধান্দায় ছিল। সেইজন্য আমি প্যালেসের জমি জবরদখলের জন্য পাড়ার কিছু লোককে লাগিয়েছিলাম। জবরদখল তারা সত্যি সত্যি করত না। ওটা আমার একটা ট্যাক্‌টিক্‌স্। প্রেসার ক্রিয়েট করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঝামেলা দেখে কুমারবাহাদুর আমাকে প্যালেস বিক্রি করে দেবেন। উনি বিক্রি করতেই তো চান। পারছেন না শুধু দুর্গাপ্রসাদের জন্য। সে তাঁকে লোভ দেখাচ্ছে, আরও বেশি দাম দিয়ে প্যালেস কেনার লোক সে যোগাড় করে দেবে।'

'দুর্গাপ্রসাদের কাছে কুমারবাহাদুরের নাকি অনেক টাকা দেনা আছে?'

'থাকতে পারে।' হাজারিলাল এবার চাপা গলায় বলল, 'দেড় মাস আগে খবর পেলাম, মোহনপুর প্যালেসের দেবতা যে-কোনও দিন চুরি যাবে। তখন বাড়ি কেনার ছল নিয়ে কুমারবাহাদুরকে সাবধান করে দিলাম।'

'কী সূত্রে আপনি খবর পেলেন?'

হাজারিলাল বাঁকা হাসল। 'তা বলব না। শুধু জেনে রাখুন সব জায়গায় আমার লোক আছে। জয় ট্রেডার্সেও আছে। বীরেশ্বর তখন আমেরিকায় ছিল। স্মাগল্‌ড্‌ মাল কীভাবে সে সেখানকার কাস্টম্‌স্‌ ডিপার্টমেন্টের চোখের আড়ালে ডেলিভারি নেবে তার ধান্দায় ছিল। কিন্তু মাল ঠিক সময়ে পৌঁছাল না। কুমার-বাহাদুর অ্যালার্ট ছিলেন। তাই নরহরি ঠাকুরমশাই হয়তো দেবতা চুরির সুযোগ পায়নি।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঠাকুরমশাই খুন হয়ে গেলেন!'

'আমার লোক তার গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু পুলিস আমার লোকদের হ্যারাশ করছে।'

'কিন্তু নরহরি ভট্টাচার্য খুন হলেন কেন?'

'খুন করেছে দুর্গাপ্রসাদের লোক। প্রথমে আমার সন্দেহ ছিল, ঠাকুরমশাই অ্যাডভান্স কিছু টাকা নিয়েছিল। কিন্তু দেবতা চুরি করে দিতে পারছিল না। সেই জন্য হয়তো রাগে দুর্গাপ্রসাদ তাকে মেরে ফেলেছে। বাট আই নিড ইওর হেল্প্‌।'

'বলুন!'

হাজারিলাল একটু পরে বলল, 'কাল বিকেলে আমার লোক বীরেশ্বরকে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ি ঢুকতে দেখেছে। তাই আমার অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে। দেবতা চুরি করে ঠাকুরমশাই হয়তো দুর্গাপ্রসাদের লোককে দিয়েছিল। আর বাকি টাকা যাতে না দিতে হয়, সেইজন্য ঠাকুরমশাইকে খুন করা হয়েছে। তাছাড়া ঠাকুর-মশাইয়ের মুখ বন্ধ করারও দরকার হয়েছিল। এখন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট্‌ করছি, দেবতা সত্যি চুরি হয়েছে কি না ইনভেস্টিগেট করে দেখুন। আর যদি চুরি হয়ে থাকে, তা যাতে স্মাগ্‌ল্‌ড্‌ না হয় তার ব্যবস্থা করুন। আপনার সব খবর আমি পেয়ে গেছি কর্নেল সরকার! ইউ আর দি রাইট পার্সন টু ডু ইট। হ্যাঁ—পুলিস যেমন আমাকে বিশ্বাস করে না, তেমনি আমিও পুলিসকে বিশ্বাস করি না। আই নো দেম ওয়েল।'

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জেলে বললেন, 'দেবতা চুরি যায়নি। কুমারবাহাদুর কাল দুপুরে মন্দিরে গিয়ে দেখে এসেছে। তখন আমি তাঁর বাড়িতে ছিলাম।'

হাজারিলাল গুম হয়ে বলল, 'মন্দিরের দরজা লোহার। ওতে একটা তালা আছে। আপনি কি দেখেছেন সেটা?'

'দেখেছি। তালাটা—'

হাত তুলে হাজারিলাল বলল, 'জানি। হাইটেকনলজির প্রসেসে তৈরি তালা। আমি বলি কী, আপনি কুমারবাহাদুরকে ইনসিস্ট্ করে হোক যেভাবে হোক, নিজের চোখে দেখুন দেবতা আছেন কি না।'

'কেন? কুমারবাহাদুর কি মিথ্যা বলেছেন আমাকে?'

'বলতেও পারেন।'

'কেন বলবেন?'

'বাড়ির দাম আমি ন-লাখ দিতে চেয়েছি। আর দেবতার দাম ধরা হয়েছে তিরিশ লাখ। থার্টি নাইন লাখ্স্। ব্যস্। আর বেশি কিছু বলব না।' বলে হাজারিলাল উঠে দাঁড়াল।

কর্নেলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। 'কুমারবাহাদুর তাঁদের পূর্বপুরুষের গৃহদেবতা বেচতে চান এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

"বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। আচ্ছা! আমি চলি। আপনি আমাকে টেলিফোনে শুধু কথাটা জানিয়ে দেবেন। আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দেব। নমস্তে!'

হাজারিলাল নমস্কার করে চলে গেল। কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। চুরুটের নীল ধোঁয়ার একটা রেখা আঁকাবাঁকা হয়ে তাঁর টাক ছুঁয়ে ফ্যানের বাতাসে মিলিয়ে গেল।

হতবাক হয়ে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বললাম, 'তাহলে সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল।'

কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন, 'মোটেও হল না। আরও জট পাকিয়ে গেল।'

'আর জট কোথায়?'

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে ব্যস্ত হলেন। সাড়া পেয়ে বললেন, 'ছন্দা! আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। তোমার শ্বশুরমশাই কি ঘুম থেকে উঠেছেন?...বাহ্! ভালো খবর! এক বাহাদুরকে ফিরে পেয়ে আরেক বাহাদুর চাঙ্গা হতেই পারেন! তো বীরেশ্বর কি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন?... শোনো! আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। শ্বশুরমশাইকে কিছু জানিও না এখন। উনি বিরক্ত হতে পারেন। তুমি নীচে অপেক্ষা করবে। রাখছি।'

টেলিফোন রেখে কর্নেল বললেন, 'বীরেশ্বর ছন্দাদের বাড়িতে যাননি।

টেলিফোনে ওকে বলেছেন, এখন ব্যস্ত বলে যেতে পারছেন না। সময় পেলে যাবেন। যাই হোক, চলো! বেরিয়ে পড়া যাক। এক মিনিট! আমার কিটব্যাগ আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আসি। এটা একটা অভিযান জয়ন্ত!'...

আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মোহনপুরে প্যালেসে পৌঁছুলাম। ছন্দা পোর্টিকোর নীচে অপেক্ষা করছিল। হলঘর থেকে বাহাদুর বেরিয়ে এসে সেলাম দিল। একগাল হেসে বলল, 'কুমারসাবকে আমি থোড়াথোড়া হাঁটাতে পারছি কর্নিলসাব! হাত-পা মালিশ করে দিচ্ছি। আমি এক-রকম মালিশ জানি। আমার বাবার কাছে শিখেছিলাম। আমাদের পাহাড়ি মুলুকের বুঢ়া আদমিরা সবাই জানে। কভি পাহাড়ে থেকে গিরে গেলে এইরকম আচানক হাত-পায়ে খিঁচ ধরে যায়। এইটা পেরালিসিস না আছে কর্নিলসাব!'

ছন্দা বললেন, 'বাহাদুর! গেট বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

বাহাদুর বলল, 'কুমারসাব আমাকে এক কামে ভেজলেন। গেট বন্ধ করে যাচ্ছি। লেকিন কিছু দরকার থাকে তো বলুন।'

'কিছু দরকার নেই। শ্বশুরমশাই তোমাকে কোথায় পাঠাচ্ছেন?'

বাহাদুর গুম হয়ে বলল, 'মানা আছে বহুনানিদিদি! বলতে পারব না।'

সে চলে গেলে ছন্দা বাঁকা মুখে বললেন, 'বুঝেছি। আবার হাজারিলালের ফাঁদে শ্বশুরমশাই পা দিতে যাচ্ছেন। আপনারা আসুন!'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি ছন্দা। তোমার একটু সহযোগিতা চাই!'

'বলুন!'

'তুমি মন্দিরে যাওয়ার দরজাটা খুলে দাও। আর ওপরে গিয়ে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের হাত মালিশ করো। আমি লক্ষ্য করেছি, বিছানায় উনি শুলে ওঁর ডানদিকে উত্তরের জানালা দিয়ে নীচে মন্দিরটা চোখে পড়ে। তুমি জানালার ধারে বসে হাত মালিশ করবে।'

ছন্দা অবাক হয়ে শুনছিল। বলল, 'কিন্তু উনি আমাকে হাত মালিশ করতে যদি না দেন?'

'তুমি ইনসিস্ট্ করবে। তাহলে আমার ধারণা, উনি আপত্তি করবেন না।'

ছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আজ থেকে টিনির স্কুলে ছুটি শুরু হয়েছে। বরং টিনিকেও ওঁর পা মালিশ করতে বলছি। টিনিকে উনি বাধা দেবেন না! সেই সুযোগে আমিও কাজে লেগে যাব।'

'ইউ আর ইনটেলিজেন্ট্।'

ছন্দা মন্দিরে যাওয়ার দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আমি তালা এঁটে দিচ্ছি। আপনারা লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবেন। কাল দেখলাম, সিঁড়িটা এখনও মজবুত আছে।'

করিডরে মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! তুমি দেয়াল ঘেঁষে চুপিচুপি পশ্চিমের ফুলগাছগুলোর আড়ালে যাও। ওখানে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করো। ডাকাতি করতে যাচ্ছি দিন-দুপুরে। সাবধান!'

চমকে উঠেছিলাম। 'কর্নেল! আপনি—'

ঠোঁটে আঙুল রেখে কর্নেল চোখে হেসে বললেন, 'বীরু!'

'তার মানে?'

'বীরু! ব্যস! আর কোনও কথা নয়।'

ফুলগাছের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে অবাক হয়ে দেখলাম, কর্নেল দিব্যি মন্দিরের দরজা খুলে ফেললেন। দরজার কপাটদুটো নিঃশব্দে লিফটের কপাটের মতোই দুধারে ঢুকে গেল। কর্নেলও ঢুকে গেলেন এবং মিনিট দুই পরে বেরিয়ে এলেন। তারপর মন্দিরের দরজার কপাট টেনে বন্ধ করলেন। ফুলগাছের কাছে এসে চাপা গলায় বললেন, 'আগে তুমি উঠে যাও।'

বললাম, "আশ্চর্য! আপনি চিচিং ফাঁক মন্ত্র জানেন দেখছি!'

কর্নেল হাসলেন। 'চিচিং ফাঁক বীরু'।

নীচে নেমে বাঁয়ে ঘোরো

সেই মরচে ধরা ঘোরালো লোহার সিঁড়ি দিয়ে আগে কর্নেল উঠে গেলেন। তারপর আমি সাবধানে উঠলাম। দোতলার বারান্দায় উঠে কর্নেল আস্তে কাসলেন। একটু পরে ছন্দা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, 'এবার তোমার শ্বশুরমশাইকে খবর দাও, আমি দেখা করতে চাই।'

ছন্দা টিনির পড়ার ঘরে আমাদের বসিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'আমি আপনাকে মন্দিরে ঢুকতে দেখলাম। আপনি কীভাবে লক খুললেন?'

'যথাসময়ে বলব। তুমি কুমারবাহাদুরকে খবর দাও!'

'ছন্দা ভেতরের একটা দরজার পর্দা সরিয়ে চলে গেলেন। বললাম, মন্দিরের ভেতরে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন তো?'

কর্নেল বললেন, 'এখন কোনও কথা নয়। মুখ বুজে থাকবে কিন্তু!'

মুখ বুজে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে টিনির সাড়া পাওয়া গেল। সেই সেই ছড়াটা সুর ধরে বলতে বলতে এ ঘরে ঢুকল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে কর্নেলকে বলল, 'আবার তুমি এসেছ? তোমার দাড়ি সাদা কেন বলোনি। এখন বলবে?'

কর্নেল তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন। সে ছিটকে সরে গেল। কর্নেল বললেন, 'তোমার দাদু কেন বেড়াল মেরেছেন আগে বলো। তা হলে বলব।'

'আমি দেখিনি।'

'আহা, বেড়ালটাকে তো দেখেছ?'

'বাহাদুর মরা বেড়ালটা কোথায় ফেলে দিয়েছে। বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে।'

'তুমি তা-ও দেখনি?'

এই সময় ছন্দা এসে বললেন, 'আপনারা ভেতরে যান। আমি টিনিকে স্নান করাতে যাচ্ছি! টিনি! কাল স্নান করিসনি। আজ স্নান করবি আয়!'

টিনি পালাতে যাচ্ছিল। ছন্দা তাকে ধরে ফেললেন। আমরা ভেতরের ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটা ফাঁকা। শুধু কিছু পুরনো আসবাব এক কোণে পড়ে আছে। কর্নেল ঘরটায় চোখ বুলিয়ে সামনের দরজার পর্দা তুলে বললেন, 'মর্নিং কুমার-বাহাদুর!' তারপর ঢুকে গেলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিছানায় পা ছড়িয়ে কালকের মতো বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। মুখটা খুব গম্ভীর মনে হল। বললেন, 'কর্নেলসায়েব! আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনি আবার এসেছেন। একজন ক্রিমিন্যাল শয়তানের জন্য আপনার কেন এত দয়া বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। আমিও বসলাম। তারপর কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'কুমার বাহাদুর! আপনি ভুল বুঝেছেন। আমার কয়েকটা ক্যাকটাসের গায়ে কতকগুলো রেড স্পট দেখা দিয়েছে। সেই ব্যাপারেই আমি কথা বলতে এসেছি। আমার মনে পড়ছে, আপনি একবার আমাকে কী একটা ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। প্লিজ যদি সেটা আবার লিখে দেন—'

'আমার ডান হাত অচল। আমি বলছি, আপনি লিখে নিন।'

কর্নেল পকেট থেকে নোট বই আর কলম বের করে কী একটা খটোমটো নাম লিখে নিলেন। তারপর বললেন, 'এটা কি যে কোন কেমিস্টের কাছে পাওয়া

যায় ? সেবার অনেক ঘোরাঘুরি করে তবে একটা ফার্মেসিতে পেয়েছিলাম ।'

'এই পাড়াতেই পাবেন । কুণ্ডু ফার্মেসি—আপনার যাওয়ার পথেই পড়বে ।'

'ছন্দা বলল, আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে অসুখটা নাকি প্যারালেসিস নয় ।'

সত্যেন্দ্রনাথ ডান হাত একটু তুলে মুঠো করে বললেন, 'ইচ্ছাশক্তি । তবে বাহাদুর কাল থেকে ওদের দেশের প্রথায় মালিশ করে দিচ্ছে । একটু আগে বউমাও মালিশ করে দিচ্ছিল । আশা করি, এই সপ্তাহের শেষাশেষি চলাফেরা করতে পারব । আপনি কফি খাবেন তো ?'

'ধন্যবাদ ! অসময়ে আর বিরক্ত করব না আপনাকে । চলি ।'

'বসলেন তো আর একটু বসুন । কথা আছে ।'

'বলুন !'

'আমি ঠিক করেছি, একটু সুস্থ হলেই এই বাড়ি আর গৃহদেবতাসহ মন্দির বেচে দিয়ে মোহনপুরে আমাদের পুরনো বাড়িতে গিয়ে থাকব । মোহনপুরের বাড়িটা আপনার মনে পড়তে পারে । মেরামত করলে আরও দু-তিনশো বছর বাস করা যাবে ।'

কর্নেল হাসলেন । 'হাজারিলাল মোট উনচল্লিশ লাখ টাকা দিতে চেয়েছে । তাই না ?'

সত্যেন্দ্রনাথ নড়ে বসলেন । 'কে বলল আপনাকে ? বউমা ?'

'নাহ্ । ছন্দা জানে না ।'

'তা হলে কে বলল ?'

'আমার সোর্স বলা বারণ । দুঃখিত কুমার বাহাদুর !' কর্নেল তাঁর কাঁধের কিটব্যাগটা খুলে দুই উরুর ওপর রাখলেন । ফের বললেন, 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-বিষ্ণুমূর্তির জন্য হাজারিলাল আপনাকে তিরিশ লাখ টাকা দিতে চেয়েছে, তা সত্যিই মন্দিরে আছে তো ?'

সত্যেন্দ্রনাথের চোখ জ্বলে উঠল । 'কেন থাকবে না ? কাল আপনারা যখন ছিলেন, তখন আমি দেখে এসেছি । তারপর সন্ধ্যায় আবার বাহাদুরের সাহায্যে মন্দিরে গিয়ে নিজেই পুজো করেছি । আজ ভোরেও—'

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, 'সেটা আসল না নকল মূর্তি, তা লক্ষ্য করেছেন কি ?'

'কালকের মতো আবার আপনি আসল-নকলের প্রশ্ন তুলছেন । কাল

আপনাকে বলেছি, আসল মূর্তিই আছে। আপনার এই হেঁয়ালির উদ্দেশ্য কী।'

'কুমারবাহাদুর! কাল আপনি মন্দিরে ঢুকে প্রদীপ জ্বেলেছিলেন কি?'

'না জ্বাললেও আমাদের গৃহদেবতাকে আমি চিনি। দুচোখে পদ্মরাগ মণি বসানো আছে। বাইরের আলোতেও তা ঝকমঝ করে ওঠে। তাছাড়া কাল সন্ধ্যায় এবং আজ ভোরে প্রদীপ জ্বেলেছিলাম।'

'হাজারিলাল বয়সে তরুণ হলেও দুর্ধর্ষ। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা সাংঘাতিক দুর্বৃত্ত। পুলিসও ওকে সমীহ করে চলে। তাই বলছি, মূর্তি যদি নকল হয়, আপনার বিপদ ঘটতে পারে।'

'আমার মেজাজ নষ্ট করে দিচ্ছেন কর্নেলসায়েব! আপনি আমার পুরনো বন্ধু। অন্য কেউ হলে—' জোরে শ্বাস ছেড়ে সত্যেন্দ্রনাথ ফের বললেন, 'আমার ব্যাপারে প্লিজ আপনি নাক গলাবেন না।'

কর্নেল হাসলেন। 'এ কথা ঠিক যে, নরহরিবাবুকে বিষ্ণুমূর্তি চুরি করানোর জন্যই আপনার ছেলের বন্ধু বীরেশ্বর সেন আপনার গৃহদেবতার সেবাইতপদে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মভয়ে হোক বা আপনার ভয়েই হোক, উনি তা পারছিলেন না। আপনি যখন তা টের পেলেন, তখন সতর্ক হলেন। এবার বলুন, কীভাবে আপনি টের পেয়েছিলেন?'

সত্যেন্দ্রনাথ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কর্নেলের কথা শুনছিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আপনি সব জানেন তা হলে?'

'কিছু তথ্য থেকেই এটা আমার অনুমান মাত্র।'

সত্যেন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'গত-মাসে একদিন বিকেলে দোতলার বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ থামের পাশ দিয়ে দেখি, নীচের গেটে দুর্গাদাস নরহরির হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে চলে গেল। সেটা কোমরে ধুতির ভাঁজে গুঁজে নরহরি চলে এল। আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সন্ধ্যায় ও মন্দিরে পুজো করতে ঢুকল। তখন আমি ওর থাকার ঘর সার্চ করলাম। মহাধূর্ত। বীরেশ্বরের এয়ারমেলে পাঠানো একটা চিঠি দেয়ালের একটা তাকে পঞ্জিকার তলায় রেখে দিয়েছে। চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে মাথায় আগুন ধরে গেল। কিন্তু ওকে আমি পারিবারিক প্রথা অনুসারে তালা খোলার সিস্টেম সরল বিশ্বাসে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে পুলিসের হাতে তুলে দিই বা তাড়িয়ে দিই, একই কথা। পুলিসের হাত থেকে একদিন ছাড়া পাবেই। তখন কী হবে?'

'এক মিনিট। তালার নাম্বারিং সিস্টেম চেঞ্জ করা যায় না?'

'নাহ্। তবে আমি চেষ্টা করতে জানি বলে রটিয়েছি। কেন তা বুঝতেই পারছেন!'

'হ্যাঁ। বাই দি বাই—জয়রাম শর্মা কি সত্যি নিখোঁজ হয়েছিলেন?'

সত্যেন্দ্রনাথ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি সবই জানেন দেখছি!'

'জেনেছি। জানার দরকার ছিল।'

'কার স্বার্থে?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'নিজের স্বার্থে। আমার হবির কথা আপনার অজানা নয়।'

'প্লিজ কর্নেল সায়েব! আর এতে নাক গলাবেন না।'

''ঠিক আছে। গলাব না। কিন্তু আপনি টাকার লোভে হাজারিলালকে নকল বিষ্ণুমূর্তিসহ মন্দির বেচে দেবেন না। আপনার মঙ্গলের জন্য বলছি। মোহনপুরে গিয়েও হাজারিলালের হাত থেকে আপনি বাঁচবেন না। দুর্গাপ্রসাদ মোহনপুরের লোক। কিন্তু সে থাকে এখানে। আপনি ভেবেছেন, মোহনপুরে দুর্গাপ্রসাদের ঘাঁটি আছে। কিন্তু যতই ঘাঁটি থাক, অন্তত আপনার নাতনি টিনির কথা চিন্তা করুন। হাজারিলাল সব পারে।'

সত্যেন্দ্রনাথ গলার ভেতর বললেন, ''কিন্তু হাজারিলালের মূল উদ্দেশ্য দেবতাসহ মন্দির কেনা। ওর প্রচণ্ড ধর্মবাতিক আছে। এদিকে দুর্গাপ্রসাদের কাছে আমার দু লক্ষ টাকার বেশি দেনা।'

'দুর্গাপ্রসাদ বাড়ি কিনতে চাইলে তাকে বেচে দিন।'

'একই প্রব্লেম। হাজারিলাল রেগে যাবে। আমার হয়েছে উভয়সঙ্কট। দুর্গাপ্রসাদ যেমন দুর্বৃত্ত, হাজারিলালও তা-ই।'

'তাহলে কোনও থার্ড পার্টিকে বেচে দিয়ে কলকাতাতেই কোথাও ফ্ল্যাট কিনে চলে যান।' বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। 'শুনলাম কাল আপনি এক আছাড়ে একটা বেড়াল মেরেছেন। বেড়ালের নাকি নটা প্রাণ! এক আছাড়ে বেড়াল মারা কম কথা নয়।'

সত্যেন্দ্রনাথ বালকের মতো গর্জন করলেন, 'কী বলতে চান আপনি?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'বলতে চাই, পূর্বপুরুষের জমিদারি রক্ত আপনার শরীরে আছে।'

কথাটা বলেই কর্নেল দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমিও ওঁকে

অনুসরণে দেরি করলাম না। মনে হচ্ছিল, পিঠে জমিদারি শ্বাসপ্রশ্বাসের গরম ঝাপটা এসে লাগছে।

ই এম বাইপাসের মোড়ে কর্নেল কালকের মতোই নেমে গেলেন। আমার মনে অনেক প্রশ্ন থেকে গেল। কিন্তু তখন কিছু করার ছিল না।...

সেদিন সন্ধ্যার পর সত্যসেবক পত্রিকার অফিস থেকে কর্নেলকে ফোন করলাম। ষষ্ঠীচরণ সাড়া দিয়ে বলল, 'বাবামশাই বেইরেছেন। বলে গেছেন, কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই।'

কর্নেলের সাড়া পেলাম টেলিফোনে পরদিন সকালে। 'মর্নিং ডার্লিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।'

বললাম, 'মর্নিং ওল্ড বস! মোটেও হয়নি। চিচিং ফাঁকের ব্যাপারটা—'

'বীরু!'

'ওঃ কর্নেল!'

'চলে এস। এখানেই তোমার বেরেকফাস্টোর নেমন্তন্ন।'

টেলিফোন রেখে ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে পৌনে নটা বেজে গেল।

বৃদ্ধ রহস্যভেদী ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন। বললেন, 'আজ কেউ আসছে না। কাজেই নটায় ব্রেকফাস্ট করা যাবে। তারপর কফি।'

বললাম, 'কাল সন্ধ্যায় ফোন করেছিলাম। কোথায় বেরিয়েছিলেন?'

'বিকেলে ছন্দা ফোন করেছিল। আমি চলে আসার পর কুমারবাহাদুর জঙ্গবাহাদুরের কোলে চেপে মন্দিরে গিয়েছিলেন। তারপর কেলেঙ্কারি!' কর্নেল তাঁর অট্টহাসিটি হাসলেন। 'মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি নেই। কুমারবাহাদুর হইচই বাধিয়েছেন। পুলিসকেও জানিয়েছেন। আমিই নাকি মূর্তি চুরি করেছি।'

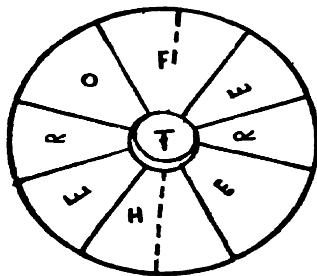
'সে কী! তারপর?'

'ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, আমি যাচ্ছি। তারপর ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ নন্দীকে ফোন করলাম। প্রথমে গেলাম তাঁর কাছে। যতটুকু বলা উচিত, তাঁকে বললাম। তারপর মোহনপুর প্যালেসের দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ শুনি বোমাবাজি শুরু হয়েছে। ওই এরিয়ায় দুর্গাপ্রসাদ আর হাজারিলালের গ্যাং প্রায়ই মারপিট বোমাবাজি করে। লোকেদের গা সওয়া ঘটনা। পুলিসও যায়—তবে যথাসময়ে। কী আর করা যাবে? ফিরে আসছিলাম। পথে আমার আরেক পুরনো বন্ধু রঘুবীর সিংহের সঙ্গে দেখা। দমদম ক্যান্টনমেণ্টে ছিলেন। উনিও

এক কর্নেল। রিটায়ার করে বাড়ি করেছেন ভি. আই পি রোডের ধারে। তাঁর বাড়িতে আড্ডা দিয়ে—'

ষষ্ঠী এ ঘরে ব্রেকফাস্টের ট্রে আনায় ওঁর কথায় বাধা পড়ল। ব্রেকফাস্টের সময় বললাম, 'এবার চিচিং ফাঁকের ব্যাপারটা বলুন।'

কর্নেল বাঁ হাতে টেবিলের ড্রয়ার থেকে সেই তালার নক্‌শাটা বের করে বললেন, 'এটা লক করো। তালাটার মাঝখানে বিন্দুগুলো জোড়ের চিহ্ন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তালাটা দুটো অর্ধবৃত্তে ভাগ হয়ে যায়।'



বললাম, 'মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল বললেন, 'টিনির ছড়াটা স্মরণ করো।'

'নীচে নেমে বামে ঘোরো।
তবেই তোমার পোয়াবারো॥'

কর্নেল ছড়াটা আওড়ে বললেন, "টি হরফ থেকে নীচে নামলে এইচ। এবার দেখ, ওপরে এক হরফের কাছে তীরচিহ্ন আছে। নবটা ঘোরাতে হবে বাঁদিকে। এইচ থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে এইচ-কে তীর চিহ্ন-আঁকা এক হরফের জায়গায় পৌঁছে দিলেই পোয়াবারো। তার মানে, কার্যসিদ্ধি। দরজা খুলে যাবে! এই সূত্রটার সঙ্গে নরহরি ভট্টচার্যের অন্তিম মুহূর্তের কথাটা আমার মাথায় এসেছিল। উনি বীরু বলেছিলেন, নাকি 'হিরো' বলছিলেন? লক করো! নীচে নেমে অর্থাৎ এইচ হরফ থেকে বাঁদিকে পড়লে হিরো শব্দটা পেয়ে যাচ্ছি। মধ্যিখানে নবের ওপর লেখা টি হরফ ইংরেজি টার্ন শব্দটার আভাস দিচ্ছে। টি মানে টার্ন অর্থাৎ ঘোরাও বা ঘোরো।'

'বাহ্‌! বেশ কারিগরি কৌশল তো! আবার এই দেখুন, টি থেকে নেমে ডাইনে ঘুরে পড়লে THEREFORE দাঁড়াচ্ছে!'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে করেই এই গোলকধাঁধা তৈরি করা হয়েছে।'

'কিন্তু নরহরিবাবু হিরো শব্দটা বলেছিলেন কেন?'

'মন্দিরের দরজার ভেতরদিকেও একই তালা আছে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেও লক্ড হয়ে যাবে। তখন বেরুতে হলে নব ঘুরিয়ে তীরচিহ্ন থেকে 'হিরো' সাজাতে হবে।' কর্নেল স্যাণ্ডউইচের শেষ টুকরো গিলে বললেন, 'তখন ছন্দাকে আসতে দেখে আততায়ী মন্দিরের ভেতর লুকিয়ে দরজা টেনে লক্ড করে দিয়েছিল। নরহরি ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন, 'হিরো' শুনে বুদ্ধিমতী ছন্দা যদি তালার দিকে তাকায়—সেটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তুমি হিরো শব্দটা শোনার পর তালার দিকে তাকালেই শব্দটা দেখতে পাবে। তাই না?'

'ঠিক বলেছেন। এখন চোখে পড়ছে বটে!'

'ছন্দার 'হিরো' শুনে লকের দিকে তাকানো উচিত ছিল। কারণ এত বছর ধরে সে তালাটা দেখছে। সে জানে, তালাটার নাম্বারিং সিস্টেম আছে। বিশেষভাবে ঘোরালেই খুলে যাবে। কিন্তু সে হিরো শুনতে বীরু শুনেছিল। কারণ বীরু তার স্বামীর বন্ধু। পরিচিত নাম।'

'তা হলে আততায়ী তখন মন্দিরের ভেতর ছিল বলছেন?'

'ছিল। নরহরিবাবু চেয়েছিলেন, ছন্দা আততায়ীকে দেখুক।'

'কে সেই আততায়ী?'

কর্নেল বাঁহাতে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সলিউশনের শিশি বের করে বললেন। 'এটা তরল আঠার মতো পিছল। জলের মতো রঙ। কোনও শান-বাঁধানো জায়গায় মাখিয়ে রাখলে চোখে পড়বে না। কিন্তু পা দিলেই তুমি আছাড় খাবে। আচমকা আছাড় খেলে সব বীরপুরুষও অসহায়! হ্যাঁ—এটা ক্যাকটাসের রোগের সেই ওষুধ।'

চমকে উঠে বললাম, 'বলেন কী! তা হলে কুমারবাহাদুর—'

'হ্যাঁ। কুমারবাহাদুরই খুনী। জমিদারি রক্ত। তা ছাড়া বরাবর রাগী এবং গোঁয়ার মানুষ। এদিকে গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণুকে যে চুরি করতে চাইবে, সে-ই তাঁর কোপানলে পড়বে। জয়রাম শর্মা নিখোঁজ হয়েছিলেন। তখন কুমারবাহাদুরের পক্ষে কাকেও নিখোঁজ করে ফেলার সামর্থ্য ছিল। এখন অতটা নেই। সময়ও পাননি। ছন্দা দৌড়ে গিয়েছিল!'

'কিন্তু ওঁর ডান হাত এবং পায়ে—'

'ওটা চালাকি। নরহরি ভট্টাচার্যকে মেরে ফেলার ফাঁদ।'

'কিন্তু নরহরিবাবুকে খতম করে উনি মন্দিরে আত্মগোপন করেছিল, সে-কথা আপনি কী ভাবে জানতে পারলেন?'

'ছন্দা কাল টেলিফোনে আমার কাছে স্বীকার করেছে, নরহরিবাবুর খুন হওয়ার খবর তার শ্বশুরমশাইকে দিতে এসে সে বিছানায় ওঁকে দেখতে পায়নি। কোনও সত্যিকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না।'

'তা হলে ছন্দা জানত কে খুনী?'

'তার সন্দেহ স্বাভাবিক। তখন নীচের হলঘরে মন্দিরে যাওয়ার দরজা ওদিক থেকে বন্ধ ছিল। কাজেই কুমারবাহাদুর লোহার ঘোরালো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। ছন্দা আমাদের ওই সিঁড়িটা দেখিয়ে এবং সেখান দিয়ে নামতে বলে আসলে একটা আভাস দিতে চেয়েছিল। তাছাড়া কাল টেলিফোনে তার শ্বশুরমশাইয়ের বেড়াল মারার ঘটনা বলেও সে জানাতে চেয়েছিল, কুমারবাহাদুরের হাত কত ক্ষিপ্রগতি এবং কত শক্তিশালী!'

'আপনি পুলিসকে জানাচ্ছেন না কেন?'

'যা প্রমাণ করতে পারব না, তা জানিয়ে কী লাভ? কুমারবাহাদুর এতটুকু সূত্র রাখেননি, যা দিয়ে ওঁকে খুনী প্রমাণ করা যাবে। হাতুড়ি বা লোহার বড় জাতীয় কিছু ওঁর মার্ডার উইপস। সেটা উনি সম্ভবত মন্দিরের পেছনের পুকুরে ফেলে দিয়েছেন। তা উদ্ধার করা কঠিন। করলেও প্রমাণ করা যাবে না, উনিও ওটা ব্যবহার করেছিলেন।'

কর্নেল ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। ফের বললেন, "নরহরিবাবুকে খতমের প্ল্যান রাত্রেই করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তোমাকে দেখিয়েছিলাম, মন্দিরের ঘাটের দরজার সামনে ঝোপঝাড় দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকা করা হয়েছে। কিছু ডালও ভাঙা হয়েছে। হুড়কো খুলে এমনভাবে রাখা আছে, তাতে মনে হবে খুনী ওই পথেই চলে গেছে। কিন্তু মাকড়সার জালের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পেরেছিলাম, খুনী দরজা খুলে পালায়নি। ক্লিয়ার?'

'ক্লিয়ার। কিন্তু ফোনে আপনাকে হুমকি দিচ্ছিল কে?'

'কুমারবাহাদুর। বোঝা যাচ্ছে, নরহরিবাবু ফিরে গিয়ে ছন্দাকে আমার কথা চুপিচুপি জানিয়েছিলেন। কুমারবাহাদুর তো সত্যিই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী নন। ওত পেতে তা শুনে থাকবেন। জয়ন্ত! এ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ। কারণ দ্বিতীয় বার হুমকির ফোন আমি স্বকর্ণে শুনেছি। কুমারবাহাদুরের কণ্ঠস্বর আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তবে তোমার চোখে পড়া উচিত ছিল, ছন্দার ঘরের টেলিফোনের একটা এক্সটেনশন লাইন কুমারবাহাদুরের ঘরেও ছিল। তিনি আড়ি

পেতে আমার সঙ্গে ছন্দার বাক্যালাপ শুনতেন, এটা স্পষ্ট।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। বলো ছন্দা! ...হাওড়া স্টেশন থেকে? কী ব্যাপার?...ঠিক আছে। উইশ ইউ গুডলাক।...সেটাই ভালো তোমাদের আর মোহনপুর প্যালেসে থাকা উচিত নয়। মোহনপুরেই...তো শোনো! আমি তোমার শ্বশুরমশাইকে নকল বিষ্ণুমূর্তিটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম।...দিতে হবে না?...উনি ফেরত চান না? ঠিক আছে। এগেন উইশ ইউ গুডলাক। ছাড়ছি।'

টেলিফোন রেখে কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'কুমারবাহাদুর তাঁর বউমা আর নাতনিকে নিয়ে মোহনপুরে পাড়ি জমালেন। সঙ্গে আসল বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে যাচ্ছেন। বাহাদুর মোহনপুর প্যালেসের কেয়ারটেকার হয়ে রইল। অ্যামব্যাসাডর গাড়িটা ছন্দা অগত্যা দুর্গাপ্রসাদকে মাত্র তিরিশ হাজার টাকায় বেচে দিয়েছে। পরে বাড়িটা বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু একজন খুনীকে আপনি ছেড়ে দিলেন, এটা ঠিক হল না।'

'ডার্লিং! আবার বলছি, এ একটা বিচিত্র কেস। খুনী কে, তা জানা সত্ত্বেও আমি প্রমাণ করতে পারব না। কী আর করা যাবে? তবে এ তো ঠিক, আমাদের দেশের অমূল্য সব মূর্তি যারা বিদেশে পাচার করছে, তাদের ক্ষমা করা যায় না। বিশেষ করে বীরেশ্বরের লোক নরহরিবাবু আমার সাহায্য নিতে কেন এসেছিলেন, তোমার তা বোঝা উচিত। উনি আমার সাহায্যে আসল মূর্তিটা হাতাতে চেয়েছিলেন, তাই নয় কি? আমি আসল মূর্তি উদ্ধার করে দিলে তা উনি বীরেশ্বরকে দিতেন।'

বৃদ্ধ রহস্যভেদী কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে চুরুট ধরালেন। তারপর অভ্যাস মতো চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। চুরুটের নীল ধোঁয়ার একটা রেখা আঁকাবাঁকা হয়ে ওঁর টাক ছুঁয়ে ফ্যানের বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে চুরুটের এক টুকরো ছাই ওঁর দাড়িতে যথারীতি খসে পড়ল। সাদা ঝকমকে দাড়িতে ছাইটুকু পড়ামাত্র বলে উঠলাম, 'সভ্যতার ওপর বর্বরতা!'

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, 'কী?'

হাসতে হাসতে বললাম, 'সেদিন বিকেলে আপনি বলছিলেন, সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতার সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য। বর্বরতা ছাড়া সভ্যতা হয়তো টেঁকে না।'

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। বর্বরতা দিয়ে সভ্যতাকে রক্ষার প্রয়োজন মাঝে-মাঝে দেখা দেয়। একটা নরহত্যার বর্বরতা একটা সভ্যতা সম্পদকে রক্ষা করেছে।'

'আহা! আমি বলছি আপনার দাড়িতে ছাইয়ের টুকরো—'

'একই কথা।' বলে বৃদ্ধ রহস্যভেদী আবার চোখ বুজে হেলান দিলেন।...